



বাংলা



বিসিএস



ব্যাংক জব



NTRCA



প্রাইমারি



বিজেএস





বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পূর্ণ প্রস্তুতি

বাংলাদেশের সকল সরকারি ও বেসরকারি নিয়োগ পরীক্ষার সম্পূর্ণ বাংলা প্রস্তুতি

প্রকাশনায়
চাকরি বাংলা

সম্পাদনায়
রায়হান খান

প্রকাশনা ও প্রতিষ্ঠান পরিচিতি

চাকরি বাংলা (Chakri Bangla) সম্পর্কে

“চাকরি বাংলা” বাংলাদেশের প্রতিযোগিতামূলক চাকরির পরীক্ষার্থীদের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য অনলাইন প্ল্যাটফর্ম, যেখানে বিসিএস, ব্যাংক জব, শিক্ষক নিবন্ধন (NTRCA), প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক, বিজেএস (সহকারী জজ) ও বার কাউন্সিল নিয়োগ পরীক্ষার পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি, বিষয়ভিত্তিক মডিউল, বিগত সালের প্রশ্ন সমাধান এবং টাইমড মডেল টেস্ট এক জায়গায় প্রদান করা হয়। ২০২৪ সালের ২২ মার্চ প্রতিষ্ঠিত এই প্ল্যাটফর্মের লক্ষ্য মানসম্পন্ন প্রস্তুতিমূলক কনটেন্ট সকলের জন্য উন্মুক্ত ও সহজলভ্য করে তোলা।

কেন চাকরি বাংলা?

- প্রতিটি প্রশ্ন প্রকৃত নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র থেকে সংগৃহীত ও যাচাইকৃত — কোনো অনুমাননির্ভর প্রশ্ন নেই।
- প্রতিটি উত্তরের সাথে বিস্তারিত ও মৌলিক ব্যাখ্যা, যা মুখস্থ নয় বরং ধারণা স্পষ্ট করে।
- বিষয়ভিত্তিক ও টপিকভিত্তিক সুসংগঠিত বিন্যাস, ফলে নির্দিষ্ট টপিক দ্রুত খুঁজে অনুশীলন করা যায়।
- নিয়মিত হালনাগাদ ও অভিজ্ঞ সম্পাদকীয় টিম কর্তৃক মানসম্পন্ন সম্পাদনা।

এই বইটি সম্পর্কে

এই সংকলনে বাংলাদেশের বিভিন্ন সরকারি নিয়োগ পরীক্ষায় (বিসিএস, ব্যাংক জব, শিক্ষক নিবন্ধন, প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক, বিজেএস ও বার কাউন্সিল) আগত বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ের সকল প্রশ্নের সঠিক উত্তর ও বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ একটি পূর্ণাঙ্গ সমাধান প্রদান করা হলো। ব্যাকরণ ও সাহিত্যের প্রতিটি টপিকে পৃথক অধ্যায়ে সাজিয়ে মূল নিয়ম, উদাহরণ ও প্রকৃত পরীক্ষার প্রশ্ন একত্রে উপস্থাপন করা হয়েছে, এবং পরিশিষ্টে প্রতিটি টপিকের সম্পূর্ণ প্রশ্নব্যাংক প্রশ্নের পাশে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার নাম উল্লেখসহ সংকলিত হয়েছে। সকল ব্যাখ্যা মৌলিক ও চাকরি বাংলার নিজস্ব গবেষণার ফসল।

যোগাযোগ

ওয়েবসাইট:	www.chakribangla.com
ই-মেইল:	info@chakribangla.com
মোবাইল:	+৮৮ ০১৭৩৮ ৯৫০ ৯৯৬
ঠিকানা:	ঢাকা, বাংলাদেশ

মতামত ও পরামর্শ

বইটিতে কোনো ভুল-ত্রুটি চোখে পড়লে অথবা ভবিষ্যৎ সংস্করণের জন্য কোনো পরামর্শ থাকলে আমাদের ই-মেইল বা ফেসবুক পেজে জানানোর অনুরোধ রইলো। পাঠকদের মতামত আমাদের প্রতিটি সংস্করণকে আরও নির্ভুল ও সমৃদ্ধ করে তোলে।

এই বইয়ের সকল প্রশ্ন সংশ্লিষ্ট নিয়োগ পরীক্ষা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত প্রশ্নপত্র থেকে সংগৃহীত; প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর ও ব্যাখ্যা চাকরি বাংলার সম্পাদকীয় টিম কর্তৃক প্রণীত। এই বইয়ের কোনো অংশ প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত পুনরুৎপাদন বা প্রচার করা যাবে না। সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত © চাকরি বাংলা।

সূচিপত্র

১ ভূমিকা ও প্রস্তুতির কৌশল	১৩
১ বাংলা প্রস্তুতির কৌশল ও এই বইয়ের ব্যবহারবিধি	১৪
১.১ বাংলা অংশের সাধারণ গঠন: ব্যাকরণ ও সাহিত্য	১৪
১.১.১ এই বই কাদের জন্য লেখা	১৪
১.১.২ ব্যাকরণ অংশ: মৌলিক নিয়ম থেকে শব্দভাণ্ডার পর্যন্ত	১৫
১.১.৩ সাহিত্য অংশ: প্রাচীন যুগ থেকে সমকাল পর্যন্ত	১৬
১.১.৪ এই বইয়ে ব্যবহৃত বিভিন্ন বক্স ও উপকরণ	১৬
১.১.৫ পড়ার সময় নোট নেওয়ার অভ্যাস	১৭
১.২ কোন টপিক কতটা গুরুত্বপূর্ণ	১৮
১.২.১ ব্যাকরণ অংশে গুরুত্বের বণ্টন	১৮
১.২.২ সাহিত্য অংশে গুরুত্বের বণ্টন	১৮
১.৩ অধ্যয়নভিত্তিক প্রস্তুতির রোডম্যাপ	১৯
১.৩.১ সময়স্বল্পতায় রোডম্যাপ সমন্বয়	২০
১.৪ পরীক্ষার হলে সাধারণ কৌশল	২০
১.৪.১ পরীক্ষার ঠিক আগের সময়টুকু কীভাবে কাজে লাগাবেন	২১
২ বাংলা ব্যাকরণ: মৌলিক অংশ	২২
২ ধ্বনিতত্ত্ব ও বর্ণ পরিচয়	২৩
২.১ ধ্বনি ও বর্ণের পার্থক্য	২৩
২.২ স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি	২৪
২.২.১ স্বরধ্বনি	২৪
২.২.২ ব্যঞ্জনধ্বনি	২৫
২.৩ উচ্চারণস্থান অনুযায়ী ব্যঞ্জনধ্বনির শ্রেণিবিভাগ	২৬
২.৪ ঘোষ-অঘোষ ও মহাপ্রাণ-অল্পপ্রাণ ধ্বনি	২৭
২.৫ যুক্তব্যঞ্জন ও উচ্চারণের নিয়ম	২৮
২.৫.১ যুক্তব্যঞ্জন গঠনের নিয়ম	২৮
২.৫.২ ফলাজনিত উচ্চারণ-পরিবর্তন	২৮
২.৫.৩ ধ্বনি পরিবর্তনের সাধারণ নিয়ম	২৮
২.৬ অনুশীলনী	২৯
৩ সন্ধি	৩১
৩.১ সন্ধি কাকে বলে	৩১
৩.১.১ বাংলা শব্দের সন্ধি	৩১
৩.১.২ তৎসম শব্দের সন্ধি	৩২
৩.২ সন্ধির প্রধান তিনটি শ্রেণি	৩২
৩.২.১ স্বরসন্ধি	৩৩
৩.২.২ ব্যঞ্জনসন্ধি	৩৪
৩.২.৩ বিসর্গসন্ধি	৩৫
৩.৩ সন্ধি বিচ্ছেদের নিয়ম	৩৬
৩.৪ ব্যতিক্রমী ও গুরুত্বপূর্ণ সন্ধি	৩৭
৩.৫ অনুশীলনী	৩৮
৪ সমাস	৪০
৪.১ সমাস কাকে বলে ও এর উপকারিতা	৪০
৪.২ সমাসের প্রধান শ্রেণিবিভাগ	৪১
৪.২.১ দ্বন্দ্ব সমাস	৪২

8.২.২	তৎপুরুষ সমাস	8৩
8.২.৩	কর্মধারয় সমাস	88
8.২.8	বহুব্রীহি সমাস	8৫
8.২.৫	দ্বিগু সমাস	8৬
8.২.৬	অব্যয়ীভাব সমাস	8৬
8.২.৭	নিত্য সমাস ও অলুক সমাস	8৬
8.৩	সমাস চেনার কৌশল	8৭
8.8	অনুশীলনী	8৮
৫	কারক ও বিভক্তি	৫১
৫.১	কারক ও বিভক্তি: সংজ্ঞা ও পার্থক্য	৫২
৫.২	কারকের ছয়টি প্রধান শ্রেণি	৫৩
৫.২.১	কর্তৃকারক	৫৩
৫.২.২	কর্মকারক	৫৪
৫.২.৩	করণকারক	৫৫
৫.২.৪	সম্প্রদান কারক	৫৬
৫.২.৫	অপাদান কারক	৫৬
৫.২.৬	অধিকরণ কারক	৫৭
৫.৩	কারক নির্ণয়ের পদ্ধতিগত কৌশল	৫৯
৫.৪	কারক ও সম্বন্ধ পদের পার্থক্য	৬০
৫.৫	অনুশীলনী	৬১
৬	প্রত্যয়	৬৩
৬.১	প্রত্যয় কাকে বলে	৬৩
৬.২	প্রত্যয়ের প্রধান দুটি শ্রেণি	৬৪
৬.২.১	কৃৎ প্রত্যয়	৬৪
৬.২.২	তদ্ধিত প্রত্যয়	৬৬
৬.৩	বাংলা ও সংস্কৃত (তৎসম) প্রত্যয়ের পার্থক্য	৬৮
৬.৪	প্রত্যয় চেনার কৌশল	৬৮
৬.৫	অনুশীলনী	৬৯
৭	উপসর্গ	৭২
৭.১	উপসর্গ কাকে বলে	৭২
৭.২	উপসর্গের প্রধান তিনটি শ্রেণি	৭৩
৭.২.১	তৎসম (সংস্কৃত) উপসর্গ	৭৪
৭.২.২	বাংলা (খাঁটি বাংলা) উপসর্গ	৭৫
৭.২.৩	বিদেশি উপসর্গ	৭৬
৭.৩	উপসর্গ ও অনুসর্গের পার্থক্য	৭৬
৭.৪	অনুশীলনী	৭৭
৩	বাংলা ব্যাকরণ: পদ ও বাক্য	৭৯
৮	পদ প্রকরণ	৮০
৮.১	পদ কাকে বলে	৮০
৮.২	পদের প্রধান পাঁচটি শ্রেণি	৮১
৮.২.১	বিশেষ্য পদ	৮১
৮.২.২	সর্বনাম পদ	৮৩
৮.২.৩	বিশেষণ পদ	৮৫
৮.২.৪	ক্রিয়া পদ	৮৬
৮.২.৫	অব্যয় পদ	৮৭
৮.৩	পদ নির্ণয়ের পদ্ধতিগত কৌশল	৮৮
৮.৪	অনুশীলনী	৯০
৯	বাচ্য	৯২
৯.১	বাচ্য কাকে বলে	৯২
৯.২	বাচ্যের প্রধান তিনটি শ্রেণি	৯৩
৯.২.১	কর্তৃবাচ্য	৯৪
৯.২.২	কর্মবাচ্য	৯৪
৯.২.৩	ভাববাচ্য	৯৫
৯.২.৪	কর্মকর্তৃবাচ্য: একটি বিশেষ প্রকরণ	৯৬

৯.৩	বাচ্য রূপান্তরের নিয়ম	৯৭
৯.৪	কোন ক্রিয়ায় কোন বাচ্য সম্ভব	৯৮
৯.৫	অনুশীলনী	৯৯
১০	বাক্য প্রকরণ ও রূপান্তর	১০১
১০.১	বাক্য কাকে বলে ও এর গুণাবলি	১০১
১০.১.১	আকাঙ্ক্ষা	১০১
১০.১.২	আসক্তি	১০২
১০.১.৩	যোগ্যতা	১০২
১০.২	গঠন অনুযায়ী বাক্যের শ্রেণিবিভাগ	১০২
১০.২.১	সরল বাক্য	১০৩
১০.২.২	জটিল বা মিশ্র বাক্য	১০৩
১০.২.৩	যৌগিক বাক্য	১০৩
১০.৩	বাক্য রূপান্তরের পদ্ধতি	১০৪
১০.৪	অর্থ অনুযায়ী বাক্যের শ্রেণিবিভাগ	১০৬
১০.৫	অনুশীলনী	১০৭
১১	বাক্য শুদ্ধিকরণ	১১০
১১.১	বাক্য শুদ্ধির প্রধান কারণসমূহ	১১০
১১.১.১	বাহুল্য দোষ (একই অর্থবাচক শব্দের পুনরাবৃত্তি)	১১১
১১.১.২	গুরুচণ্ডালী দোষ	১১২
১১.১.৩	লিঙ্গ, বচন ও পুরুষজনিত অসংগতি	১১২
১১.১.৪	অনুসর্গ ও উপসর্গের ভুল প্রয়োগ	১১৩
১১.১.৫	বাগধারা ও প্রবাদে ভুল ব্যবহার	১১৪
১১.১.৬	উপমা ও উৎপ্রেক্ষার আপত্তিকর/ভুল প্রয়োগ	১১৪
১১.১.৭	পদক্রম ও বাক্যাংশের বিন্যাসজনিত ত্রুটি	১১৫
১১.২	বাক্য শুদ্ধিকরণের পদ্ধতিগত কৌশল	১১৬
১১.৩	অনুশীলনী	১১৭
১২	বিরাম চিহ্ন	১১৯
১২.১	বিরাম চিহ্নের প্রয়োজনীয়তা	১১৯
১২.২	বাংলা বিরাম চিহ্নের সম্পূর্ণ তালিকা	১২০
১২.২.১	দাঁড়ি (।)	১২১
১২.২.২	কমা (,)	১২১
১২.২.৩	প্রশ্নবোধক ও বিস্ময়সূচক চিহ্ন (? ও !)	১২২
১২.২.৪	উদ্ধরণ চিহ্ন (" ")	১২৩
১২.৩	বিরাম চিহ্ন রেফারেন্স কার্ড	১২৩
১২.৪	অনুশীলনী	১২৪
১৩	গত্ব ও ষত্ব বিধান	১২৬
১৩.১	গত্ব বিধান	১২৬
১৩.১.১	ঋ, র, ষ-এর পরে ৎ	১২৬
১৩.১.২	কতিপয় নির্দিষ্ট শব্দে ৎ	১২৮
১৩.১.৩	যেখানে ৎ হয় না	১২৯
১৩.২	ষত্ব বিধান	১৩০
১৩.২.১	ই/ঐ/উ/ঊ/ঋ-কার এবং ক/র-এর পরে ষ	১৩০
১৩.২.২	উপসর্গযুক্ত শব্দে ষত্ব	১৩১
১৩.২.৩	কতিপয় নির্দিষ্ট শব্দে ষ	১৩২
১৩.৩	অনুশীলনী	১৩৪
১৪	বানান শুদ্ধিকরণ	১৩৬
১৪.১	বাংলা একাডেমি প্রমিত বানানরীতি: মূলনীতি	১৩৬
১৪.২	সাধারণ ভুল বানানের ধরন	১৩৭
১৪.২.১	ই-কার ও ঐ-কার জনিত বিভ্রান্তি	১৩৭
১৪.২.২	উ-কার ও ঊ-কার জনিত বিভ্রান্তি	১৩৮
১৪.২.৩	দন্ত্য স, তালব্য শ, মূর্ধ্যা ষ জনিত বিভ্রান্তি	১৩৯
১৪.২.৪	য-ফলা, জ, ও অন্যান্য	১৪০
১৪.৩	বিদেশি শব্দের প্রমিত বানান	১৪২
১৪.৪	বানান শুদ্ধ রাখার কৌশল	১৪২

১৪.৫ অনুশীলনী	১৪৩
১৫ ভাষারীতি: সাধু ও চলিত	১৪৬
১৫.১ ভাষারীতি কাকে বলে ও এর ঐতিহাসিক পটভূমি	১৪৬
১৫.২ সাধু ভাষারীতি	১৪৭
১৫.২.১ বৈশিষ্ট্য	১৪৭
১৫.২.২ ব্যবহারক্ষেত্র	১৪৭
১৫.৩ চলিত ভাষারীতি	১৪৮
১৫.৩.১ বৈশিষ্ট্য	১৪৮
১৫.৩.২ ব্যবহারক্ষেত্র	১৪৮
১৫.৪ সাধু ও চলিত রীতির তুলনামূলক পার্থক্য	১৪৯
১৫.৫ রীতি নির্বাচনের সাধারণ নীতি	১৫০
১৫.৬ গুরুচণ্ডালী দোষ	১৫০
১৫.৭ অনুশীলনী	১৫১
৪ শব্দভাণ্ডার ও ভাষার ইতিহাস	১৫৩
১৬ সমার্থক ও বিপরীত শব্দ	১৫৪
১৬.১ সমার্থক শব্দ (প্রতিশব্দ)	১৫৫
১৬.১.১ সমার্থক শব্দের বৈচিত্র্যের উৎসগত কারণ	১৫৫
১৬.১.২ গুরুত্বপূর্ণ সমার্থক শব্দ-গুচ্ছ (রেফারেন্স তালিকা)	১৫৬
১৬.২ বিপরীত শব্দ (বিপরীতার্থক শব্দ)	১৫৭
১৬.২.১ বিপরীত শব্দ গঠনের পদ্ধতি	১৫৭
১৬.২.২ গুরুত্বপূর্ণ বিপরীত শব্দ (রেফারেন্স তালিকা)	১৫৮
১৬.৩ সমার্থক ও বিপরীত শব্দ নির্ণয়ের কৌশল	১৬০
১৬.৪ একই শব্দের একাধিক অর্থ (প্রসঙ্গেদে সমার্থক শব্দ পরিবর্তন)	১৬০
১৬.৫ অনুশীলনী	১৬১
১৭ এক কথায় প্রকাশ	১৬৪
১৭.১ এক কথায় প্রকাশ কাকে বলে	১৬৪
১৭.২ বিষয়ভিত্তিক রেফারেন্স তালিকা	১৬৫
১৭.২.১ ব্যক্তি ও পেশা সংক্রান্ত	১৬৫
১৭.২.২ স্থান সংক্রান্ত	১৬৬
১৭.২.৩ স্বভাব ও গুণ সংক্রান্ত	১৬৭
১৭.২.৪ বিমূর্ত ধারণা ও সময় সংক্রান্ত	১৬৮
১৭.৩ পরীক্ষায় সমাধানের কৌশল	১৬৯
১৭.৪ অনুশীলনী	১৭০
১৮ বাগধারা ও প্রবাদ-প্রবচন	১৭২
১৮.১ বাগধারা কাকে বলে	১৭২
১৮.১.১ বাগধারার প্রকৃত অর্থ নির্ণয়ের কৌশল	১৭৪
১৮.২ বিষয়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ বাগধারা	১৭৪
১৮.২.১ প্রাণীবাচক বাগধারা	১৭৫
১৮.২.২ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গবাচক বাগধারা	১৭৬
১৮.২.৩ প্রকৃতি ও বস্তুবাচক বাগধারা	১৭৭
১৮.২.৪ সংখ্যাবাচক বাগধারা	১৭৮
১৮.৩ প্রবাদ-প্রবচন	১৭৯
১৮.৩.১ ইংরেজি প্রবাদের নিকটতম বাংলা প্রতিরূপ নির্ণয়ের কৌশল	১৮০
১৮.৪ বাগধারা মনে রাখার কৌশল	১৮১
১৮.৫ অনুশীলনী	১৮২
১৯ শব্দের উৎস: তৎসম, তদ্ভব, দেশি ও বিদেশি	১৮৪
১৯.১ বাংলা শব্দভাণ্ডারের উৎস অনুযায়ী শ্রেণিবিভাগ	১৮৪
১৯.১.১ তৎসম শব্দ	১৮৫
১৯.১.২ অর্ধ-তৎসম শব্দ	১৮৫
১৯.১.৩ তদ্ভব শব্দ	১৮৬
১৯.১.৪ দেশি শব্দ	১৮৬
১৯.১.৫ বিদেশি শব্দ	১৮৭
১৯.২ শব্দের উৎস নির্ণয়ের কৌশল	১৮৮

১৯.৩ অনুশীলনী	১৮৯
২০ বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ	১৯১
২০.১ ভাষা পরিবার ও বাংলার অবস্থান	১৯২
২০.২ বাংলা ভাষার ক্রমবিকাশের স্তরসমূহ	১৯৩
২০.২.১ সংস্কৃত ভাষা	১৯৩
২০.২.২ প্রাকৃত ভাষা	১৯৩
২০.২.৩ অপভ্রংশ ও অবহট্ট	১৯৪
২০.২.৪ প্রাচীন বাংলা	১৯৪
২০.৩ বাংলা ভাষার উৎপত্তি নিয়ে পণ্ডিতদের মতামত	১৯৫
২০.৪ বাংলা লিপির ইতিহাস	১৯৫
২০.৫ বাংলা উপভাষা (আঞ্চলিক ভাষারীতি)	১৯৬
২০.৬ অনুশীলনী	১৯৭
৫ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস	১৯৯
২১ প্রাচীন যুগ ও চর্যাপদ	২০০
২১.১ প্রাচীন যুগের সময়সীমা ও প্রেক্ষাপট	২০০
২১.১.১ কালবিভাজন ও সময়সীমা	২০০
২১.১.২ সামাজিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপট	২০১
২১.১.৩ সহজিয়া সাধনার মূল ভাবনা	২০১
২১.২ চর্যাপদ: আবিষ্কার ও পরিচিতি	২০১
২১.২.১ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও আবিষ্কারের কাহিনি	২০২
২১.২.২ পুঁথির নাম ও পরিচিতি	২০২
২১.২.৩ প্রকাশ ও সম্পাদনা	২০২
২১.৩ চর্যাপদের বৈশিষ্ট্য	২০৩
২১.৩.১ পদসংখ্যা ও পদকর্তার সংখ্যা	২০৩
২১.৩.২ ভাষারীতি: সঙ্ক্যাভাষা	২০৩
২১.৩.৩ শব্দভাণ্ডার ও ভাষারীতির মিশ্রণ	২০৪
২১.৩.৪ বিষয়বস্তু ও রূপকের ব্যবহার	২০৪
২১.৩.৫ কাব্যরীতি: রাগ-রাগিণী ও সংগীতরীতি	২০৪
২১.৪ গুরুত্বপূর্ণ পদকর্তাগণ	২০৫
২১.৫ চর্যাপদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব	২০৬
২১.৫.১ ভাষাতাত্ত্বিক গুরুত্ব	২০৬
২১.৫.২ বহু-ভাষী দাবি ও শহীদুল্লাহর অবদান	২০৬
২১.৫.৩ সামাজিক ইতিহাসের দলিল হিসেবে গুরুত্ব	২০৬
২১.৫.৪ চর্যাপদ ও পরবর্তী গবেষণা	২০৭
২১.৬ অনুশীলনী	২০৭
২২ মধ্যযুগের সাহিত্য	২০৯
২২.১ মধ্যযুগের সময়কাল ও প্রেক্ষাপট	২০৯
২২.১.১ অন্ধকার যুগ (আনুমানিক ১২০১-১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ)	২১০
২২.১.২ প্রকৃত মধ্যযুগ (আনুমানিক ১৩৫০-১৮০০ খ্রিস্টাব্দ)	২১০
২২.১.৩ মধ্যযুগের সাহিত্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্য	২১০
২২.২ অনুবাদ সাহিত্য	২১১
২২.২.১ রামায়ণ অনুবাদ	২১১
২২.২.২ মহাভারত অনুবাদ	২১২
২২.২.৩ ভাগবত অনুবাদ	২১২
২২.৩ মঙ্গলকাব্য ধারা	২১৩
২২.৩.১ মনসামঙ্গল	২১৪
২২.৩.২ চণ্ডীমঙ্গল	২১৪
২২.৩.৩ ধর্মমঙ্গল	২১৫
২২.৩.৪ অনন্যদামঙ্গল	২১৫
২২.৪ বৈষ্ণব পদাবলি	২১৬
২২.৪.১ বড়ু চণ্ডীদাস	২১৭
২২.৪.২ বিদ্যাপতি	২১৭
২২.৪.৩ জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস	২১৮
২২.৫ চৈতন্যজীবনী সাহিত্য	২১৮
২২.৫.১ চৈতন্যভাগবত	২১৯

২২.৫.২ চৈতন্যচরিতামৃত	২১৯
২২.৬ নাথ সাহিত্য ও অন্যান্য ধারা	২২০
২২.৬.১ নাথ সাহিত্য	২২০
২২.৬.২ মুসলিম কবিদের অবদান	২২০
২২.৬.৩ মধ্যযুগের সাহিত্যের ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক তাৎপর্য	২২১
২২.৭ গুরুত্বপূর্ণ কবি ও গ্রন্থের সারসংক্ষেপ	২২১
২২.৮ অনুশীলনী	২২২
২৩ ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্য: আধুনিক যুগের সূচনা	২২৫
২৩.১ বাংলা গদ্যের বিকাশ	২২৫
২৩.১.১ রামমোহন রায়	২২৬
২৩.১.২ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	২২৬
২৩.১.৩ প্যারীচাঁদ মিত্র	২২৭
২৩.২ মাইকেল মধুসূদন দত্ত	২২৭
২৩.৩ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	২২৮
২৩.৪ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যিক	২২৯
২৩.৫ কালরেখায় ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্য	২৩০
২৩.৬ অনুশীলনী	২৩১
৬ বিশ্বকবি ও জাতীয় কবি	২৩৩
২৪ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	২৩৪
২৪.১ জীবন ও পরিচিতি	২৩৪
২৪.১.১ জন্ম, পরিবার ও শৈশব	২৩৫
২৪.১.২ কর্মজীবন: শিলাইদহ, শাহজাদপুর ও পতিসর	২৩৫
২৪.১.৩ বাংলাদেশে রবীন্দ্র-স্মৃতি	২৩৫
২৪.১.৪ শ্রীনিকেতন ও পল্লি-পুনর্গঠন	২৩৬
২৪.১.৫ শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতী	২৩৬
২৪.১.৬ রাজনীতি, অসহযোগ আন্দোলন ও গান্ধীর সঙ্গে সম্পর্ক	২৩৬
২৪.১.৭ বহুমুখী প্রতিভা: চিত্রকলা ও বিশ্বভ্রমণ	২৩৭
২৪.১.৮ জীবনাবসান	২৩৭
২৪.২ কাব্যগ্রন্থ	২৩৯
২৪.৩ উপন্যাস	২৪১
২৪.৪ ছোটগল্প	২৪২
২৪.৫ নাটক	২৪৩
২৪.৬ প্রবন্ধ ও অন্যান্য রচনা	২৪৪
২৪.৭ গান: রবীন্দ্রসংগীত	২৪৫
২৪.৮ নোবেল পুরস্কার ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি	২৪৬
২৪.৯ উপাধি ও প্রাপ্তি	২৪৬
২৪.৯.১ রবীন্দ্র-সাহিত্যের উত্তরাধিকার ও চলচ্চিত্রায়ণ	২৪৭
২৪.৯.২ দর্শন ও মানবতাবাদী চিন্তা	২৪৮
২৪.১০ পরীক্ষায় দ্রুত উত্তর দেওয়ার কৌশল	২৪৯
২৪.১১ অনুশীলনী	২৫০
২৫ কাজী নজরুল ইসলাম	২৫৩
২৫.১ জীবন ও পরিচিতি	২৫৩
২৫.১.১ জন্ম ও শৈশব	২৫৩
২৫.১.২ সেনাবাহিনী ও সাহিত্যজীবনের সূচনা	২৫৪
২৫.১.৩ ব্যক্তিজীবন	২৫৪
২৫.১.৪ অসুস্থতা ও শেষ জীবন	২৫৪
২৫.১.৫ উত্তরাধিকার ও প্রভাব	২৫৪
২৫.২ বিদ্রোহী কবি: প্রথম পরিচয়	২৫৫
২৫.২.১ বিদ্রোহী কবিতা ও অগ্নিবীণা	২৫৫
২৫.২.২ ধূমকেতু পত্রিকা ও কারাবরণ	২৫৫
২৫.২.৩ কারাগারে অনশন ও রাজবন্দীর জবানবন্দী	২৫৫
২৫.২.৪ রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা ও শ্রমিক আন্দোলন	২৫৬
২৫.৩ কাব্যগ্রন্থ	২৫৬
২৫.৩.১ কাব্যধারার বিবর্তন	২৫৭

২৫.৪ উপন্যাস, গল্প ও নাটক	২৫৭
২৫.৪.১ উপন্যাস	২৫৭
২৫.৪.২ গল্পগ্রন্থ	২৫৭
২৫.৪.৩ নাটক	২৫৮
২৫.৫ প্রবন্ধ ও অন্যান্য গদ্যরচনা	২৫৮
২৫.৬ সাম্য ও মানবতার কবি	২৫৮
২৫.৬.১ মানুষ কবিতা ও অসাম্প্রদায়িক চেতনা	২৫৮
২৫.৬.২ কুলি-মজুর ও শ্রমজীবী মানুষের কবি	২৫৯
২৫.৭ নজরুলসংগীত	২৫৯
২৫.৭.১ নজরুলগীতির বৈচিত্র্য	২৫৯
২৫.৭.২ গজল ধারার প্রবর্তন	২৫৯
২৫.৮ জাতীয় কবির মর্যাদা ও স্বীকৃতি	২৬০
২৫.৯ নজরুল ও রবীন্দ্রনাথ: তুলনামূলক পরিপ্রেক্ষিত	২৬০
২৫.৯.১ সম্পর্কের প্রকৃতি	২৬০
২৫.৯.২ শৈলীগত পার্থক্য	২৬০
২৫.১০ মেজরুল-চর্চা: প্রতিষ্ঠান ও স্মৃতিরক্ষা	২৬১
২৫.১১ জীবনরেখা: একনজরে	২৬১
২৫.১২ অনুশীলনী	২৬২
৭ আধুনিক ও সমকালীন সাহিত্য	২৬৫
২৬ আধুনিক কবি ও কবিতা	২৬৬
২৬.১ পঞ্চপাণ্ডব: ত্রিশের দশকের আধুনিক কবিগণ	২৬৬
২৬.১.১ জীবনানন্দ দাশ	২৬৮
২৬.১.২ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত	২৬৯
২৬.১.৩ বিষ্ণু দে	২৭০
২৬.১.৪ অমিয় চক্রবর্তী	২৭০
২৬.১.৫ বুদ্ধদেব বসু	২৭১
২৬.২ অন্যান্য উল্লেখযোগ্য আধুনিক কবি	২৭১
২৬.৩ অনুশীলনী	২৭৩
২৭ আধুনিক ঔপন্যাসিক ও কথাসাহিত্য	২৭৬
২৭.১ যুগের প্রেক্ষাপট ও প্রধান ধারা	২৭৬
২৭.২ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	২৭৭
২৭.২.১ জীবন ও সাহিত্যিক পরিচিতি	২৭৭
২৭.২.২ উল্লেখযোগ্য রচনা	২৭৮
২৭.২.৩ স্মরণীয় নারী চরিত্র	২৭৯
২৭.২.৪ বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্য	২৭৯
২৭.২.৫ চলচ্চিত্র, অনুবাদ ও উত্তরাধিকার	২৭৯
২৭.২.৬ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য — এক নজরে	২৮০
২৭.৩ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	২৮০
২৭.৩.১ জীবন ও সাহিত্যিক অভিমুখ	২৮০
২৭.৩.২ উল্লেখযোগ্য রচনা	২৮০
২৭.৩.৩ চলচ্চিত্রায়ন ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি	২৮১
২৭.৩.৪ প্রধান চরিত্র: অপূর পরিবার	২৮১
২৭.৩.৫ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য — এক নজরে	২৮২
২৭.৪ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	২৮২
২৭.৪.১ জীবন ও রাজনৈতিক অভিমুখ	২৮২
২৭.৪.২ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য — এক নজরে	২৮৩
২৭.৫ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	২৮৩
২৭.৫.১ জীবন ও সাহিত্যিক অভিমুখ	২৮৩
২৭.৫.২ মনস্তাত্ত্বিক বাস্তববাদ	২৮৪
২৭.৫.৩ প্রধান চরিত্র	২৮৪
২৭.৫.৪ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য — এক নজরে	২৮৫
২৭.৫.৫ সাহিত্যিক তুলনা: চার দিকপাল একনজরে	২৮৫
২৭.৬ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ঔপন্যাসিক	২৮৬
২৭.৬.১ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ও আখতারুজ্জামান ইলিয়াস — গুরুত্বপূর্ণ তথ্য	২৮৭

২৭.৭ সাহিত্য থেকে চলচ্চিত্র ও নাট্যরূপে	২৮৮
২৭.৮ ভাষাশৈলীর তুলনামূলক পরিচয়	২৮৮
২৭.৮.১ সংক্ষিপ্ত রচনাপঞ্জি — বছরভিত্তিক দ্রুত পুনরালোচনা	২৮৯
২৭.৯ অনুশীলনী	২৮৯
২৮ নাটক ও প্রবন্ধ সাহিত্য	২৯২
২৮.১ বাংলা নাটকের বিকাশ	২৯২
২৮.২ গুরুত্বপূর্ণ নাট্যকারগণ	২৯৩
২৮.২.১ দীনবন্ধু মিত্র	২৯৩
২৮.২.২ মধুসূদন দত্ত ও গিরিশচন্দ্র ঘোষ	২৯৪
২৮.২.৩ রবীন্দ্রনাথের নাটক	২৯৪
২৮.২.৪ আধুনিক নাট্যকারগণ	২৯৫
২৮.৩ প্রবন্ধ সাহিত্যের বিকাশ	২৯৭
২৮.৪ গুরুত্বপূর্ণ প্রাবন্ধিকগণ	২৯৮
২৮.৪.১ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ	২৯৮
২৮.৪.২ প্রমথ চৌধুরী	২৯৯
২৮.৪.৩ আধুনিক প্রাবন্ধিকগণ	৩০০
২৮.৫ নাটক ও প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারা: একনজরে	৩০১
২৮.৬ গুরুত্বপূর্ণ পারিভাষিক শব্দ	৩০৩
২৮.৭ অনুশীলনী	৩০৪
২৯ বাংলাদেশের সাহিত্য ও মুক্তিযুদ্ধের সাহিত্য	৩০৬
২৯.১ ভাষা আন্দোলনের সাহিত্য	৩০৬
২৯.২ মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস ও গল্প	৩০৮
২৯.২.১ জহির রায়হান	৩০৮
২৯.২.২ আনোয়ার পাশা	৩০৮
২৯.২.৩ শওকত ওসমান	৩০৯
২৯.২.৪ অন্যান্য	৩০৯
২৯.৩ মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক কবিতা	৩১০
২৯.৪ স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের কথাসাহিত্য	৩১১
২৯.৫ বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড ও সাহিত্যিক ক্ষতি	৩১৩
২৯.৬ অনুশীলনী	৩১৫
৩০ সাহিত্য পুরস্কার ও উপাধি	৩১৭
৩০.১ আন্তর্জাতিক পুরস্কার	৩১৭
৩০.১.১ নোবেল পুরস্কার	৩১৭
৩০.২ ভারতীয় জাতীয় পুরস্কার	৩১৮
৩০.২.১ জ্ঞানপীঠ পুরস্কার	৩১৮
৩০.২.২ সাহিত্য অ্যাকাডেমি পুরস্কার	৩১৯
৩০.৩ বাংলাদেশের জাতীয় পুরস্কার ও সম্মাননা	৩১৯
৩০.৩.১ একুশে পদক	৩১৯
৩০.৩.২ স্বাধীনতা পুরস্কার	৩১৯
৩০.৩.৩ বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার	৩২০
৩০.৪ অন্যান্য উল্লেখযোগ্য পুরস্কার	৩২০
৩০.৪.১ আদমজী সাহিত্য পুরস্কার	৩২০
৩০.৪.২ জগত্তারিণী পদক ও নাসিরউদ্দিন স্বর্ণপদক	৩২১
৩০.৪.৩ কলিঙ্গ পুরস্কার	৩২১
৩০.৫ ঐতিহাসিক উপাধিসমূহ	৩২১
৩০.৫.১ ছদ্মনাম বনাম উপাধি	৩২৩
৩০.৬ পুরস্কার ও উপাধি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার কৌশল	৩২৩
৩০.৭ অনুশীলনী	৩২৪
৮ চূড়ান্ত প্রস্তুতি	৩২৬
৩১ চূড়ান্ত রিভিশন ও ট্রিক শিট	৩২৭
৩১.১ ব্যাকরণ অংশের সংক্ষিপ্তসার	৩২৭
৩১.১.১ ভুল ও শুদ্ধ বানানের ঝটপট রেফারেন্স তালিকা	৩২৯
৩১.১.২ বাগধারা ও এক কথায় প্রকাশের ঝটপট রেফারেন্স	৩৩০

৩১.২ সাহিত্যের কালানুক্রমিক সারণি	৩৩১
৩১.৩ গুরুত্বপূর্ণ উপাধি ও প্রথম কীর্তির সংক্ষিপ্ত তালিকা	৩৩৩
৩১.৩.১ প্রচলিত উপাধিসমূহ	৩৩৩
৩১.৩.২ প্রথম কীর্তি ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য	৩৩৩
৩১.৪ সচরাচর গুলিয়ে ফেলা বিষয়গুলোর দ্রুত পার্থক্য	৩৩৪
৩১.৫ একনজরে গুরুত্বপূর্ণ তারিখ ও সাল	৩৩৬
৩১.৬ অধ্যয়নভিত্তিক রিভিশন চেকলিস্ট	৩৩৭
৩১.৭ পরীক্ষার হলে শেষ মুহূর্তের কৌশল	৩৩৮
৩১.৮ বইয়ের সম্পূর্ণ কাঠামো: এক নজরে মাইন্ড ম্যাপ	৩৩৯
৯ পরিশিষ্ট: সম্পূর্ণ প্রশ্নব্যাংক	৩৪০
৩২ ধ্বনিতত্ত্ব ও বর্ণ পরিচয় --- সম্পূর্ণ প্রশ্নব্যাংক	৩৪১
৩৩ সন্ধি --- সম্পূর্ণ প্রশ্নব্যাংক	৩৫৫
৩৪ সমাস --- সম্পূর্ণ প্রশ্নব্যাংক	৩৭১
৩৫ কারক ও বিভক্তি --- সম্পূর্ণ প্রশ্নব্যাংক	৩৯৩
৩৬ প্রত্যয় --- সম্পূর্ণ প্রশ্নব্যাংক	৪১৩
৩৭ উপসর্গ --- সম্পূর্ণ প্রশ্নব্যাংক	৪২৪
৩৮ পদ প্রকরণ --- সম্পূর্ণ প্রশ্নব্যাংক	৪৩০
৩৯ বাচ্য --- সম্পূর্ণ প্রশ্নব্যাংক	৪৪৮
৪০ বাক্য প্রকরণ ও রূপান্তর --- সম্পূর্ণ প্রশ্নব্যাংক	৪৫০
৪১ বাক্য শুদ্ধিকরণ --- সম্পূর্ণ প্রশ্নব্যাংক	৪৫৬
৪২ বিরাম চিহ্ন --- সম্পূর্ণ প্রশ্নব্যাংক	৪৬২
৪৩ গদ্য ও পদ্য বিধান --- সম্পূর্ণ প্রশ্নব্যাংক	৪৬৮
৪৪ বানান শুদ্ধিকরণ --- সম্পূর্ণ প্রশ্নব্যাংক	৪৭১
৪৫ ভাষারীতি: সাধু ও চলিত --- সম্পূর্ণ প্রশ্নব্যাংক	৪৯২
৪৬ সমার্থক ও বিপরীত শব্দ --- সম্পূর্ণ প্রশ্নব্যাংক	৪৯৯
৪৭ এক কথায় প্রকাশ --- সম্পূর্ণ প্রশ্নব্যাংক	৫৩৩
৪৮ বাগধারা ও প্রবাদ-প্রবচন --- সম্পূর্ণ প্রশ্নব্যাংক	৫৪৮
৪৯ শব্দের উৎসভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ --- সম্পূর্ণ প্রশ্নব্যাংক	৫৭১
৫০ বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও ইতিহাস --- সম্পূর্ণ প্রশ্নব্যাংক	৫৮৩
৫১ প্রাচীন যুগ ও চর্যাপদ --- সম্পূর্ণ প্রশ্নব্যাংক	৫৯০
৫২ মধ্যযুগের সাহিত্য --- সম্পূর্ণ প্রশ্নব্যাংক	৫৯৫
৫৩ ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্য --- সম্পূর্ণ প্রশ্নব্যাংক	৬০৭
৫৪ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর --- সম্পূর্ণ প্রশ্নব্যাংক	৬২৫
৫৫ কাজী নজরুল ইসলাম --- সম্পূর্ণ প্রশ্নব্যাংক	৬৩৭



চাকরি বাংলা
সরকারি ও বেসরকারি চাকরির প্রস্তুতি

৫৬ আধুনিক কবি ও কবিতা --- সম্পূর্ণ প্রশ্নব্যাংক	৬৪৮
৫৭ আধুনিক ঔপন্যাসিক ও কথাসাহিত্য --- সম্পূর্ণ প্রশ্নব্যাংক	৬৬৪
৫৮ নাটক ও প্রবন্ধ সাহিত্য --- সম্পূর্ণ প্রশ্নব্যাংক	৬৭৬
৫৯ বাংলাদেশের সাহিত্য ও মুক্তিযুদ্ধের সাহিত্য --- সম্পূর্ণ প্রশ্নব্যাংক	৬৮৯
৬০ সাহিত্য পুরস্কার ও উপাধি --- সম্পূর্ণ প্রশ্নব্যাংক	৭০১
৬১ বিবিধ --- সম্পূর্ণ প্রশ্নব্যাংক	৭০৪



চাকরি বাংলা

সরকারি ও বেসরকারি চাকরির প্রস্তুতি



ভূমিকা ও প্রস্তুতির কৌশল

সরকারি ও বেসরকারি চাকরির প্রস্তুতি

বাংলা প্রস্তুতির কৌশল ও এই বইয়ের ব্যবহারবিধি

বাংলাদেশে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ প্রার্থী সরকারি চাকরির প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা, শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা, ব্যাংক নিয়োগ পরীক্ষা এবং বিচার বিভাগীয় পরীক্ষাসহ নানা ধরনের নিয়োগ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন, আর এই প্রায় প্রতিটি পরীক্ষার প্রসঙ্গত্রেই একটি বিষয় প্রায় অপরিহার্যভাবে হাজির থাকে — বাংলা ভাষা ও সাহিত্য। এর পেছনে কারণ সহজ: বাংলা এমন একটি বিষয়, যেখানে সঠিক পদ্ধতিতে প্রস্তুতি নিলে খুব অল্প সময়ে সর্বোচ্চ নম্বর তোলা সম্ভব, কারণ এখানে গণিতের মতো জটিল সমীকরণ বা বিজ্ঞানের মতো দীর্ঘ তত্ত্ব নেই — আছে নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম, সুনির্দিষ্ট কিছু তথ্য আর নিয়মিত চর্চার প্রয়োজন। অথচ বাস্তবতা হলো, অনেক প্রার্থীই বাংলাকে ছোট করে দেখেন এই ভেবে যে এটি তো মাতৃভাষা, আলাদা করে পড়ার কী দরকার — আর এই ভুল ধারণার কারণেই পরীক্ষার হলে গিয়ে সন্ধি-সমাসের প্যাঁচে, বাগধারার দ্ব্যর্থকতায় কিংবা সাহিত্যিকদের জন্ম-মৃত্যু সালের গোলকধাঁধায় আটকে যান। এই বই লেখা হয়েছে ঠিক এই ফাঁকটি পূরণ করার জন্য — বাংলা ব্যাকরণ ও সাহিত্যের প্রতিটি অধ্যায়কে যুক্তিসংগত, সুবিন্যস্ত ও পরীক্ষামুখী করে উপস্থাপন করার জন্য, যাতে মুখস্থবিদ্যার বদলে প্রকৃত বোঝাপড়ার মাধ্যমে প্রস্তুতি নেওয়া যায়। মূল অধ্যায়গুলোতে প্রবেশের আগে এই ভূমিকা-অধ্যায়ে আমরা দেখব বইয়ের সামগ্রিক গঠন কেমন, বইয়ে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপকরণ কীভাবে কাজ করে, কোন অংশ কতটা গুরুত্বপূর্ণ, কোন ক্রমে পড়লে সবচেয়ে বেশি ফল পাওয়া যায়, এবং পরীক্ষার হলে বাংলা প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে কীভাবে সবচেয়ে বুদ্ধিদীপ্তভাবে সময় ও মনোযোগ ব্যবহার করা যায়।

১.১ বাংলা অংশের সাধারণ গঠন: ব্যাকরণ ও সাহিত্য

১.১.১ এই বই কাদের জন্য লেখা

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ভালো দখল যেকোনো প্রতিযোগিতামূলক নিয়োগ পরীক্ষার জন্যই সমান গুরুত্বপূর্ণ, তাই এই বইটি বিস্তৃত পরিসরের পাঠকের কথা মাথায় রেখে সাজানো হয়েছে —

- সরকারি চাকরির প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী প্রার্থী, যাদের জন্য বাংলা অংশে সর্বোচ্চ নম্বর তোলা প্রায়ই চূড়ান্ত ফলাফলের নির্ণায়ক হয়ে ওঠে।
- শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার প্রার্থী, যাদের নিজেদের বাংলা জ্ঞান মজবুত হলে পাঠদানের ক্ষেত্রেও দীর্ঘমেয়াদে উপকৃত হন।
- ব্যাংক নিয়োগ পরীক্ষার প্রার্থী, যাদের প্রসঙ্গত্রে বাংলা অংশ তুলনামূলক সংক্ষিপ্ত হলেও প্রতিটি নম্বরই গুরুত্বপূর্ণ।
- বিচার বিভাগীয় পরীক্ষার প্রার্থী, যাদের জন্য নির্ভুল ভাষাজ্ঞান ও শুদ্ধ প্রয়োগ পেশাগত দক্ষতারও অংশ।
- স্ব-অধ্যয়নরত যেকোনো শিক্ষার্থী, যিনি নিছক আগ্রহ থেকেই বাংলা ব্যাকরণ ও সাহিত্যকে গভীরভাবে জানতে চান।

এই বৈচিত্র্যময় পাঠকগোষ্ঠীর কথা মাথায় রেখেই বইয়ের প্রতিটি অধ্যায় এমনভাবে লেখা হয়েছে, যাতে কোনো নির্দিষ্ট একটি পরীক্ষার সংকীর্ণ সিলেবাসে আটকে না থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সামগ্রিক ও পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান তৈরি হয় — যা যেকোনো নিয়োগ পরীক্ষার বাংলা অংশে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।

স্কুল-কলেজ জীবন থেকেই বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি শিক্ষার্থী একটি কাঠামোর সঙ্গে পরিচিত — বাংলা বিষয়টি দুটি পত্রে ভাগ করা থাকে। **বাংলা ১ম পত্র** মূলত **সাহিত্য**-কেন্দ্রিক — এখানে গদ্য, পদ্য, নাটক, উপন্যাসের পাশাপাশি সাহিত্যিকদের জীবনী,

তাঁদের রচনাকর্ম ও সাহিত্যের ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা নিয়ে আলোচনা করা হয়। অন্যদিকে **বাংলা ২য় পত্র** মূলত **ব্যাকরণ-কেন্দ্রিক** — এখানে ভাষার গঠন, নিয়ম, শব্দ তৈরির প্রক্রিয়া ও বাক্য গঠনের কলাকৌশল আলোচিত হয়। দেশের প্রায় সব ধরনের নিয়োগ পরীক্ষার বাংলা অংশও মূলত এই একই দুই স্তরের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে, যদিও প্রশ্নের ধরন ও গভীরতা পরীক্ষাভেদে আলাদা হতে পারে।

এই বইয়ের সামগ্রিক গঠনও সচেতনভাবে এই সুপরিচিত দুই-পত্র কাঠামোকেই অনুসরণ করে সাজানো হয়েছে, যাতে পাঠক প্রথম পাতা থেকেই নিজের পরিচিত একটি কাঠামোর মধ্যে বইটির সঙ্গে সহজে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারেন। নিচে প্রতিটি অংশের অধ্যায়সমূহ সংক্ষিপ্ত পরিচিতিসহ তুলে ধরা হলো, যাতে বইয়ের যেকোনো অধ্যায়ে যাওয়ার আগে তার অবস্থান ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা তৈরি হয়।

১.১.২ ব্যাকরণ অংশ: মৌলিক নিয়ম থেকে শব্দভাণ্ডার পর্যন্ত

ব্যাকরণ অংশটি তিনটি স্তরে সাজানো হয়েছে, যাতে জটিলতা ক্রমান্বয়ে বাড়ে এবং প্রতিটি নতুন অধ্যায় আগের অধ্যায়ের ভিত্তি ওপর দাঁড়াতে পারে। প্রথম স্তরে রয়েছে ভাষার সবচেয়ে মৌলিক একক নিয়ে আলোচনা —

- **ধ্বনিতত্ত্ব ও বর্ণ পরিচয়** — ভাষার সবচেয়ে ছোট একক ধ্বনি এবং বাংলা বর্ণমালার গঠন, শ্রেণিবিভাগ ও উচ্চারণের মৌলিক নিয়ম।
- **সন্ধি** — দুটি সন্ধিহিত ধ্বনির মিলনজনিত পরিবর্তন ও তার নিয়মাবলি।
- **সমাস** — একাধিক পদ পরস্পর মিলিত হয়ে সংক্ষিপ্ত ও অর্থবহ নতুন শব্দ গঠনের প্রক্রিয়া।
- **কারক ও বিভক্তি** — ক্রিয়ার সঙ্গে বাক্যের অন্যান্য পদের সম্পর্ক নির্ণয়ের নিয়ম।
- **প্রত্যয়** — শব্দ বা ধাতুর শেষে যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠনকারী বর্ণ বা বর্ণগুচ্ছ।
- **উপসর্গ** — শব্দের শুরুতে যুক্ত হয়ে মূল অর্থে পরিবর্তন আনে এমন অব্যয়সদৃশ অংশ।

এই ছয়টি অধ্যায় মিলে ভাষার সবচেয়ে ছোট একক থেকে শুরু করে শব্দ তৈরির মূল প্রক্রিয়াগুলো ব্যাখ্যা করে। এরপরের স্তরে শব্দ থেকে শুদ্ধ ও সুবিন্যস্ত বাক্য গঠনের নিয়মগুলো ধারাবাহিকভাবে আলোচিত হয় —

- **পদ প্রকরণ** — বাক্যে ব্যবহৃত শব্দের ব্যাকরণিক শ্রেণিবিভাগ (বিশেষ্য, সর্বনাম, বিশেষণ, ক্রিয়া, অব্যয় ইত্যাদি)।
- **বাচ্য** — কর্তা, কর্ম বা ভাবের প্রাধান্য অনুযায়ী ক্রিয়ার রূপ পরিবর্তনের নিয়ম।
- **বাক্য প্রকরণ ও রূপান্তর** — সরল, জটিল ও যৌগিক বাক্যের গঠন এবং এক রূপ থেকে অন্য রূপে রূপান্তরের কৌশল।
- **বাক্য শুদ্ধিকরণ** — প্রচলিত ভুল বাক্যকে শুদ্ধ ও প্রমিত রূপে রূপান্তরের নিয়ম।
- **বিরাম চিহ্ন** — যতিচিহ্নের সঠিক ব্যবহার ও বাক্যের অর্থ স্পষ্ট রাখার কৌশল।
- **গত্ব-ষত্ব বিধান** — শব্দে ণ ও ষ ব্যবহারের সুনির্দিষ্ট নিয়ম।
- **বানান শুদ্ধিকরণ** — প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম ও প্রচলিত ভুল বানান চেনার কৌশল।
- **ভাষারীতি (সাধু ও চলিত)** — দুই রীতির পার্থক্য এবং কোন প্রসঙ্গে কোন রীতি ব্যবহার্য তার নিয়ম।

মৌলিক নিয়ম ও বাক্যতত্ত্ব আয়ত্ত হয়ে গেলে তৃতীয় স্তরে আসে শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধকরণ ও ভাষার ঐতিহাসিক পটভূমি —

- **সমার্থক ও বিপরীত শব্দ** — একই অর্থবহ ও বিপরীত অর্থবহ শব্দজোড়ের সংকলন ও ব্যবহার।
- **এক কথায় প্রকাশ** — একাধিক শব্দে প্রকাশিত ভাবকে একটি মাত্র শব্দে প্রকাশের কৌশল।
- **বাগধারা ও প্রবাদ** — বাংলা ভাষার প্রচলিত রূপক অভিব্যক্তি ও প্রবাদবাক্যের অর্থ ও প্রয়োগ।
- **শব্দের উৎস** — তৎসম, তদ্ভব, দেশি ও বিদেশি — উৎস অনুসারে শব্দের শ্রেণিবিভাগ।
- **বাংলা ভাষার ইতিহাস** — বাংলা ভাষার উৎপত্তি, বিবর্তন ও আঞ্চলিক-প্রমিত রূপের পটভূমি।

১.১.৩ সাহিত্য অংশ: প্রাচীন যুগ থেকে সমকাল পর্যন্ত

সাহিত্য অংশটিও কালানুক্রমিকভাবে সাজানো হয়েছে, যাতে একটি যুগের প্রেক্ষাপট বোঝার পরই পরবর্তী যুগে প্রবেশ করা যায়। শুরুতে রয়েছে বাংলা সাহিত্যের সূচনা থেকে আধুনিক যুগের দোরগোড়া পর্যন্ত পরিক্রমা —

- **প্রাচীন যুগ ও চর্যাপদ** — বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন ও তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব।
- **মধ্যযুগ** — মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব পদাবলি ও অনুবাদ সাহিত্যসহ মধ্যযুগীয় সাহিত্যধারা।
- **উনবিংশ শতাব্দী** — বাংলা সাহিত্যের নবজাগরণ ও আধুনিক গদ্যসাহিত্যের সূচনাপর্ব।

এই ঐতিহাসিক পটভূমির পর আসে বাংলা সাহিত্যের দুই অবিসংবাদিত স্তম্ভ, যাঁদের জন্য এই বইয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও গভীর অধ্যায় রাখা হয়েছে —

- **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর** — বিশ্বকবি জীবন, রচনাসম্ভার ও সাহিত্যে তাঁর সামগ্রিক অবদান।
- **কাজী নজরুল ইসলাম** — জাতীয় কবির জীবন, বিদ্রোহী চেতনা ও বহুমুখী সাহিত্যকর্ম।

সবশেষে আসে বিংশ শতাব্দী থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বিস্তৃত আধুনিক ও সমকালীন সাহিত্যের পরিসর —

- **আধুনিক কবি** — রবীন্দ্রনাথ-নজরুল-উত্তর সময়ের উল্লেখযোগ্য কবি ও তাঁদের কাব্যধারা।
- **আধুনিক ঔপন্যাসিক** — আধুনিক বাংলা উপন্যাসের ধারা ও উল্লেখযোগ্য ঔপন্যাসিকবৃন্দ।
- **নাটক ও প্রবন্ধ** — বাংলা নাট্যসাহিত্য ও প্রবন্ধ-সাহিত্যের বিকাশ ও প্রধান রচয়িতা।
- **বাংলাদেশের সাহিত্য ও মুক্তিযুদ্ধ** — স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের সাহিত্যধারা ও মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক রচনা।
- **সাহিত্য পুরস্কার** — উল্লেখযোগ্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সাহিত্য পুরস্কার ও তার প্রাপকবৃন্দ।

আর সবশেষে রয়েছে একটি চূড়ান্ত রিভিশন অধ্যায়, যেখানে পুরো বইয়ের গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম, তারিখ ও তথ্যগুলো এক জায়গায় শর্টকাট আকারে সংকলিত করা হয়েছে, যাতে পরীক্ষার ঠিক আগমুহুর্তে দ্রুত চোখ বুলিয়ে নেওয়া যায়।

📌 দুই পত্রের ভারসাম্য মনে রাখুন

অনেক প্রার্থী ব্যাকরণ অংশে দুর্বল বলে সাহিত্য অংশ দিয়ে সেই ঘাটতি পুষিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন, আবার কেউ কেউ উল্টোটা করেন। কিন্তু বাস্তবতা হলো, প্রায় প্রতিটি পরীক্ষায় ব্যাকরণ ও সাহিত্য — উভয় অংশ থেকেই নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রশ্ন থাকে, এবং একটি অংশে অসাধারণ দক্ষতা থাকলেও অন্য অংশে দুর্বলতা থাকলে সামগ্রিক নম্বর কমে যায়। তাই প্রস্তুতির শুরু থেকেই দুই অংশের প্রতি সমান মনোযোগ দেওয়াই সবচেয়ে নিরাপদ ও ফলপ্রসূ কৌশল।

১.১.৪ এই বইয়ে ব্যবহৃত বিভিন্ন বক্স ও উপকরণ

বইয়ের প্রতিটি অধ্যায়ে কিছু নির্দিষ্ট ধরনের বক্স ও উপকরণ বারবার ব্যবহৃত হয়েছে, যেগুলোর উদ্দেশ্য ও কার্যকারিতা আগে থেকে জানা থাকলে বইটি থেকে সর্বোচ্চ উপকার পাওয়া যায়। নিচে এই উপকরণগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেওয়া হলো —

- প্রতিটি অধ্যায়ের শুরুতে একটি **ভূমিকা-অনুচ্ছেদ** থাকে, যা সেই অধ্যায়ের বিষয়বস্তু ও গুরুত্ব সংক্ষেপে পরিচয় করিয়ে দেয়, যাতে মূল আলোচনায় প্রবেশের আগে একটি সামগ্রিক প্রেক্ষাপট তৈরি হয়।
- **শর্টকাট কৌশল** শীর্ষক বক্সে নিয়ম দ্রুত মনে রাখার কৌশল, সংক্ষিপ্তসার তালিকা বা সহজ স্মরণ-কৌশল দেওয়া থাকে, যা পরীক্ষার ঠিক আগে দ্রুত ঝালিয়ে নেওয়ার জন্য বিশেষভাবে কার্যকর।
- **মনে রাখুন** শীর্ষক বক্সে একটি নিয়মের গুরুত্বপূর্ণ দিক, ব্যতিক্রম বা অতিরিক্ত ব্যাখ্যা তুলে ধরা হয়, যা মূল আলোচনার পরিপূরক হিসেবে কাজ করে।
- **উদাহরণ** শীর্ষক বক্সে প্রতিটি নিয়মের একাধিক বাস্তব উদাহরণ ব্যাখ্যাসহ দেখানো হয়, যাতে তত্ত্ব শুধু মুখস্থ না থেকে বাস্তব প্রয়োগের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

- **সাধারণ ভুল** শীর্ষক বক্সে পরীক্ষার্থীরা সচরাচর যেসব ভুল করেন, তা তুলে ধরা হয় এবং সঠিক রূপ কী হওয়া উচিত তা ব্যাখ্যা করা হয়, যাতে একই ভুল পরীক্ষার হলে পুনরাবৃত্তি না হয়।
- **কোন পরীক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ** শীর্ষক বক্সে একটি অধ্যায় থেকে সাধারণত কোন ধরনের প্রশ্ন সবচেয়ে বেশি আসে, তার সামগ্রিক প্রবণতা তুলে ধরা হয়।
- প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে একটি **অনুশীলনী** অংশ থাকে, যেখানে বাস্তব পরীক্ষায় আসা প্রশ্ন ব্যাখ্যাসহ সমাধান করে দেখানো হয় এবং প্রশ্নের উৎস (কোন ধরনের পরীক্ষা ও সাল) উল্লেখ করা হয়, যাতে প্রশ্নের প্রকৃত ধরনের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায়।
- বইয়ের শেষাংশে একটি সম্পূর্ণ **প্রশ্নব্যাংক পরিশিষ্ট** সংযুক্ত করা হয়েছে, যেখানে প্রতিটি অধ্যায়ের অতিরিক্ত অনুশীলন প্রশ্ন একত্রে সংকলিত রয়েছে, যা চূড়ান্ত প্রস্তুতিতে ব্যাপক অনুশীলনের সুযোগ করে দেয়।

এই উপকরণগুলো একসঙ্গে ব্যবহার করলে প্রতিটি অধ্যায় থেকে সর্বোচ্চ উপকার পাওয়া সম্ভব — শুধু তত্ত্ব পড়ে যাওয়া নয়, বরং প্রতিটি বক্সে থেমে চিন্তা করে, উদাহরণ মিলিয়ে দেখে এবং অনুশীলনী সমাধান করে এগোনোই এই বইয়ের সুপারিশকৃত পড়ার পদ্ধতি।

বইয়ের শেষে সংযুক্ত সম্পূর্ণ প্রশ্নব্যাংক পরিশিষ্ট থেকে সর্বোচ্চ উপকার পেতে নিচের পদ্ধতিটি অনুসরণ করা যেতে পারে —

- প্রথমে সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ের মূল পাঠ ও অনুশীলনী সম্পূর্ণ শেষ করুন, তারপরই পরিশিষ্টের অতিরিক্ত প্রশ্নে হাত দিন — নিয়ম না জেনে প্রশ্ন সমাধানের চেষ্টা করলে তা কেবল মুখস্থবিদ্যায় পরিণত হয়।
- প্রথমবার সমাধানের সময় ঘড়ি না ধরে, নিয়ম প্রয়োগ করে ধীরে ধীরে ভাবনাচিন্তা করে উত্তর বের করুন, যাতে যুক্তিটি স্পষ্টভাবে আয়ত্ত হয়।
- দ্বিতীয়বার সমাধানের সময় সময় ধরে দ্রুত উত্তর দেওয়ার অভ্যাস করুন, যাতে প্রকৃত পরীক্ষার সময়-চাপ অনুভব করতে পারেন।
- যেসব প্রশ্নে ভুল হয়েছে, সেগুলো আলাদাভাবে চিহ্নিত করে রাখুন এবং সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ের নিয়মটি আবার পড়ে নিশ্চিত হয়ে নিন কোথায় ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল।

১.১.৫ পড়ার সময় নোট নেওয়ার অভ্যাস

প্রতিটি অধ্যায় পড়ার সময় শুধু চোখ বুলিয়ে যাওয়ার বদলে সংক্ষিপ্ত নোট নেওয়ার অভ্যাস দীর্ঘমেয়াদে অনেক বেশি কার্যকর প্রমাণিত হয়, কারণ নিজের হাতে লিখে রাখা তথ্য স্মৃতিতে অনেক দৃঢ়ভাবে গেঁথে যায় এবং চূড়ান্ত রিভিশনের সময় পুরো অধ্যায় আবার না পড়ে শুধু নিজের নোট দেখেই কাজ চালানো যায়।

- প্রতিটি অধ্যায়ের শর্টকাট কৌশল ও নিয়মগুলো নিজের ভাষায় সংক্ষেপে একটি পৃথক খাতায় টুকে রাখুন, যাতে পরবর্তীতে দ্রুত খুঁজে পাওয়া যায়।
- যেসব উদাহরণ বা ব্যতিক্রম বারবার ভুলে যাচ্ছেন, সেগুলো আলাদাভাবে চিহ্নিত করে রাখুন, যাতে পরবর্তী রিভিশনে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া যায়।
- অনুশীলনীতে ভুল হওয়া প্রশ্নগুলোর সঠিক ব্যাখ্যা নিজের ভাষায় লিখে রাখুন, কারণ নিজের ভুলের কারণ বোঝা মুখস্থ উত্তরের চেয়ে অনেক বেশি কার্যকর।

১.২ কোন টপিক কতটা গুরুত্বপূর্ণ

বাংলা অংশের সবগুলো অধ্যায় সমান গুরুত্বের নয় — বিগত বছরগুলোর প্রশ্নধারা পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, নির্দিষ্ট কিছু টপিক থেকে বারবার প্রশ্ন আসে, আবার কিছু টপিক থেকে তুলনামূলক কম প্রশ্ন আসে। সীমিত সময়ে সর্বোচ্চ ফল পেতে হলে এই আপেক্ষিক গুরুত্ব বোঝা অত্যন্ত জরুরি, যদিও এর অর্থ এই নয় যে কম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়গুলো একেবারেই বাদ দেওয়া যাবে — কারণ প্রতিটি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র একটু একটু আলাদা হয়, আর যে অধ্যায় এক পরীক্ষায় কম গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়, তা-ই আরেক পরীক্ষায় নির্ণায়ক ভূমিকা রাখতে পারে। একটি টপিক কেন বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, তার পেছনে সাধারণত কয়েকটি কারণ কাজ করে —

- **প্রশ্ন-ঘনত্ব বেশি:** কিছু টপিক থেকে প্রতিটি পরীক্ষায় একাধিক প্রশ্ন তৈরি করা সম্ভব হয় বলে প্রশ্নকর্তারা বারবার সেখান থেকে প্রশ্ন করেন।
- **নিয়মভিত্তিক ও যাচাইযোগ্য:** যেসব টপিকের নিয়ম সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট, সেখান থেকে বহুনির্বাচনী প্রশ্ন তৈরি করা তুলনামূলক সহজ।
- **ভিত্তিস্বরূপ ভূমিকা:** কিছু অধ্যায় অন্যান্য অধ্যায় বোঝার পূর্বশর্ত হওয়ায় পরোক্ষভাবেও তাদের গুরুত্ব বেড়ে যায়।
- **সর্বজনীন উপস্থিতি:** রবীন্দ্রনাথ-নজরুলের মতো কিছু বিষয় এত ব্যাপক ও সুপরিচিত যে প্রায় প্রতিটি প্রশ্নপত্রেই তাদের উপস্থিতি থাকে।

১.২.১ ব্যাকরণ অংশে গুরুত্বের বণ্টন

ব্যাকরণ অংশের মধ্যে সন্ধি, সমাস, কারক ও বিভক্তি এবং প্রত্যয় — এই চারটি অধ্যায় সাধারণত সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন বহন করে, কারণ এগুলো নিয়মভিত্তিক হওয়ায় সহজেই বহুনির্বাচনী প্রশ্ন তৈরি করা যায় এবং প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর মোটামুটি সুনির্দিষ্ট থাকে। শব্দভাণ্ডারভিত্তিক অধ্যায়গুলোও — বিশেষত সমার্থক-বিপরীত শব্দ, এক কথায় প্রকাশ ও বাগধারা-প্রবাদ — নিয়মিতভাবে উচ্চ গুরুত্ব বহন করে, কারণ এগুলো থেকে প্রতিটি পরীক্ষায় একাধিক প্রশ্ন থাকে এবং নিয়মিত চর্চার মাধ্যমে দ্রুত আয়ত্ত করা সম্ভব। পদ প্রকরণ, বাচ্য ও বাক্য প্রকরণের মতো অধ্যায়গুলো মাঝারি গুরুত্বের, তবে এগুলো ছাড়া বাক্য শুদ্ধিকরণ বা রূপান্তরের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে, তাই এগুলোকেও অবহেলা করা যায় না। বিরাম চিহ্ন, গদ্য-ষদ্য বিধান ও বানান শুদ্ধিকরণের মতো অধ্যায়গুলো তুলনামূলক কম প্রশ্ন বহন করলেও এগুলোর নিয়ম সংখ্যায় সীমিত হওয়ায় অল্প সময়ে আয়ত্ত করে নিশ্চিত নম্বর তোলা সম্ভব।

১.২.২ সাহিত্য অংশে গুরুত্বের বণ্টন

সাহিত্য অংশে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলাম প্রায় প্রতি পরীক্ষাতেই আসেন বলা চলে — এই দুই কবির জীবনী, রচনাসম্ভার, উপাধি ও বিশেষ তথ্য নিয়ে প্রশ্নের ঘনত্ব এতটাই বেশি যে, এই বইয়ে তাঁদের জন্য পৃথক ও তুলনামূলক গভীর অধ্যায় রাখা হয়েছে, যাতে এই দুটি অধ্যায় ভালোভাবে আয়ত্ত করলেই সাহিত্য অংশের একটি বড় অংশের প্রশ্নের উত্তর নিশ্চিত করা যায়। প্রাচীন যুগ, মধ্যযুগ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্য-ইতিহাস এবং আধুনিক সাহিত্যের অধ্যায়গুলো থেকে সাধারণত তুলনামূলক কম কিন্তু নিয়মিত প্রশ্ন আসে — এগুলোকে অবহেলা করার সুযোগ নেই, কারণ এই অধ্যায়গুলো থেকেও প্রতিবার নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রশ্ন থাকেই, শুধু এগুলোর প্রস্তুতি একটু ভিন্ন কৌশলে নিতে হয় — মূলত সময়রেখা (timeline), গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ও তাঁদের অবদান মনে রাখার মাধ্যমে।

🕒 সময় কম থাকলে কোন টপিকে বেশি জোর দেবেন

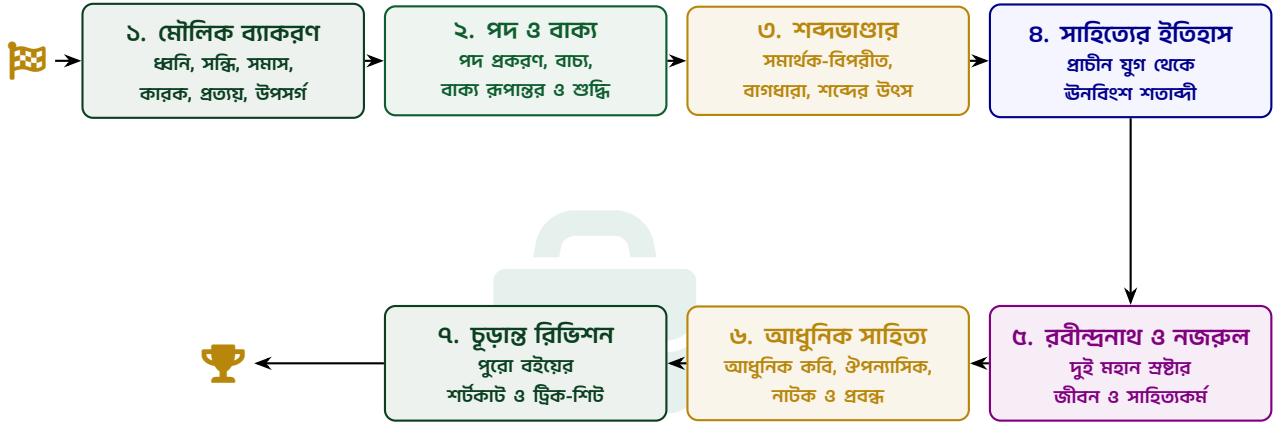
হাতে সময় সীমিত থাকলে নিচের অধ্যায়গুলোকে অগ্রাধিকার তালিকায় রাখা যেতে পারে, কারণ প্রশ্নের ঘনত্বের বিচারে এগুলো সাধারণত সবচেয়ে বেশি ফল দেয় —

- সন্ধি ও সমাস — নিয়মভিত্তিক হওয়ায় দ্রুত আয়ত্ত করা যায় এবং প্রতি পরীক্ষায় একাধিক প্রশ্ন থাকে।
- কারক ও বিভক্তি, প্রত্যয়, উপসর্গ — মৌলিক ব্যাকরণের বাকি স্তম্ভ, বাক্য গঠনের প্রায় সব প্রশ্নের ভিত্তি।
- সমার্থক-বিপরীত শব্দ, এক কথায় প্রকাশ, বাগধারা-প্রবাদ — শব্দভাণ্ডার-নির্ভর হওয়ায় নিয়মিত মুখস্থ করলে দ্রুত নম্বর পাওয়া যায়।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলাম — প্রায় প্রতিটি পরীক্ষায় নিশ্চিতভাবে প্রশ্ন থাকে এমন দুই ব্যক্তিত্ব।
- ভুল বানান শুদ্ধিকরণ ও বাক্য শুদ্ধিকরণ — নিয়মিত ভুল বানানের তালিকা মুখস্থ থাকলে সবচেয়ে কম পরিশ্রমে নম্বর তোলা যায়।

তবে মনে রাখতে হবে, এই অগ্রাধিকার তালিকা সময়-সংকটে প্রাথমিক পথনির্দেশ মাত্র — পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতির জন্য বইয়ের প্রতিটি অধ্যায়ই গুরুত্বসহকারে পড়া উচিত, কারণ যেকোনো অধ্যায় থেকেই অনির্ধারিতভাবে একাধিক প্রশ্ন আসতে পারে।

১.৩ অধ্যায়ভিত্তিক প্রস্তুতির রোডম্যাপ

একটি প্রায়ই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন হলো — বইয়ের এত অধ্যায়ের মধ্যে কোনটি আগে পড়া উচিত? যদিও প্রতিটি অধ্যায় স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং যেকোনো ক্রমে পড়া সম্ভব, তবু একটি সুচিন্তিত ক্রম অনুসরণ করলে শেখার প্রক্রিয়াটি অনেক বেশি স্বাভাবিক ও কার্যকর হয় — কারণ ব্যাকরণের পরবর্তী অনেক অধ্যায় পূর্ববর্তী অধ্যায়ের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে, এবং সাহিত্যের ইতিহাসও কালানুক্রমিকভাবে পড়লে সহজে মনে থাকে। নিচের চিত্রে সুপারিশকৃত সাত-ধাপের রোডম্যাপ দেখানো হলো —



এই রোডম্যাপের যুক্তি সহজ — প্রথমে ভাষার সবচেয়ে ছোট একক নিয়ে কাজ করা হয়, তারপর ধাপে ধাপে বড় একক নিয়ে অগ্রসর হওয়া হয়, এবং সবশেষে অর্জিত জ্ঞান ঝালিয়ে নেওয়া হয়। নিচে প্রতিটি ধাপের পেছনের যুক্তি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা হলো —

- **ধাপ ১ — মৌলিক ব্যাকরণ:** ধ্বনি থেকে শুরু করে সন্ধি, সমাস, কারক-বিভক্তি, প্রত্যয় ও উপসর্গ — এগুলো ভাষার একেবারে গোড়ার নিয়ম, যা না জানলে পরবর্তী কোনো অধ্যায়ই পুরোপুরি বোঝা যায় না।
- **ধাপ ২ — পদ ও বাক্য:** মৌলিক অংশ আয়ত্ত হয়ে গেলে সেই জ্ঞান দিয়েই পদ, বাচ্য ও বাক্য গঠনের নিয়মগুলো অনেক সহজে ধরা যায়, কারণ এই অধ্যায়গুলো মৌলিক অংশের নিয়মগুলোরই ব্যবহারিক প্রয়োগ।
- **ধাপ ৩ — শব্দভাণ্ডার:** ব্যাকরণের কাঠামো বোঝার পর শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধ করা তুলনামূলক সহজ হয়ে ওঠে, আর এই অধ্যায়গুলো নিয়মিত পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদে স্মৃতিতে বসে যায়।
- **ধাপ ৪ — সাহিত্যের ইতিহাস:** ব্যাকরণ শেষ করে সাহিত্যে প্রবেশ করলে মনোযোগে একটি সতেজ পরিবর্তন আসে; কালানুক্রমিকভাবে প্রাচীন যুগ থেকে শুরু করলে পরবর্তী যুগগুলোর প্রেক্ষাপট সহজে বোঝা যায়।
- **ধাপ ৫ — রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল:** সাহিত্যের ইতিহাসের সাধারণ প্রেক্ষাপট জানা থাকলে এই দুই মহান শ্রষ্টার অবদান ও গুরুত্ব আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করা যায়।
- **ধাপ ৬ — আধুনিক সাহিত্য:** রবীন্দ্রনাথ-নজরুল-উত্তর সময়ের কবি, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার ও প্রাবন্ধিকদের নিয়ে আলোচনা, যা সাহিত্যের ইতিহাসকে বর্তমান সময় পর্যন্ত সম্পূর্ণ করে।
- **ধাপ ৭ — চূড়ান্ত রিভিশন:** সবশেষে পুরো বইয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও নিয়মগুলো একত্রে ঝালিয়ে নেওয়ার পালা, যা পরীক্ষার ঠিক আগে আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তোলে।

📖 রোডম্যাপ ব্যবহারের নমনীয়তা

এই সাত-ধাপের রোডম্যাপ একটি সুপারিশ মাত্র, কোনো অলঙ্ঘনীয় নিয়ম নয়। যাঁর হাতে সময় বেশি নেই বা যিনি নির্দিষ্ট কোনো অধ্যায়ে আগে থেকেই দুর্বল বোধ করছেন, তিনি নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী ক্রম পরিবর্তন করে সরাসরি সেই

অধ্যায় থেকে শুরু করতে পারেন। তবে যাঁরা একেবারে গোড়া থেকে সুশৃঙ্খলভাবে প্রস্তুতি নিতে চান, তাঁদের জন্য এই ক্রমটি সবচেয়ে স্বাভাবিক ও কার্যকর পথ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

১.৩.১ সময়স্বল্পতায় রোডম্যাপ সমন্বয়

হাতে থাকা সময়ের পরিমাণ অনুযায়ী এই রোডম্যাপ কীভাবে সমন্বয় করা যেতে পারে, তার একটি সাধারণ পথনির্দেশ নিচে দেওয়া হলো —

- **সময় খুবই সীমিত হলে:** পুরো সাত ধাপ অনুসরণ না করে পূর্ববর্তী অংশে উল্লিখিত অগ্রাধিকার তালিকার অধ্যায়গুলো (সন্ধি-সমাস, কারক-প্রত্যয়-উপসর্গ, শব্দভাণ্ডার, রবীন্দ্রনাথ-নজরুল) আগে শেষ করুন, তারপর সময় বাঁচলে বাকি অধ্যায়ে ফিরে আসুন।
- **সময় মাঝারি পরিমাণে থাকলে:** রোডম্যাপ অনুসরণ করে প্রথম পাঁচ ধাপ (মৌলিক ব্যাকরণ থেকে রবীন্দ্রনাথ-নজরুল পর্যন্ত) সম্পূর্ণভাবে শেষ করুন, আধুনিক সাহিত্যের অধ্যায়গুলো সংক্ষিপ্তভাবে পড়ুন এবং শেষে রিভিশন অধ্যায়ে সময় রাখুন।
- **পর্যাপ্ত সময় থাকলে:** উপরের রোডম্যাপ অনুসরণ করে ধারাবাহিকভাবে পুরো বই শেষ করাই সবচেয়ে মজবুত ভিত্তি তৈরি করে, কারণ এতে কোনো অধ্যায়ই বাদ পড়ে না এবং প্রতিটি নতুন অধ্যায় আগের অধ্যায়ের জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে আরও সহজে আয়ত্ত হয়।

১.৪ পরীক্ষার হলে সাধারণ কৌশল

শুধু জ্ঞান থাকলেই পরীক্ষায় ভালো ফল নিশ্চিত হয় না — সেই জ্ঞানকে সীমিত সময়ের মধ্যে সঠিকভাবে প্রয়োগ করার কৌশলও সমান গুরুত্বপূর্ণ। বহু মেধাবী প্রার্থী শুধু সময় ব্যবস্থাপনার অভাবে বা পরীক্ষার হলের চাপে ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে কাঙ্ক্ষিত ফল থেকে বঞ্চিত হন। নিচে কিছু সাধারণ কিন্তু কার্যকর কৌশল আলোচনা করা হলো, যা যেকোনো ধরনের বহুনির্বাচনী নিয়োগ পরীক্ষায় প্রযোজ্য —

- **সময় ব্যবস্থাপনা:** পরীক্ষা শুরুর আগেই মনে মনে হিসাব করে নিন প্রতিটি প্রশ্নের জন্য গড়ে কত সময় বরাদ্দ করা যায়, এবং সেই হিসাব অনুযায়ী নির্দিষ্ট বিরতিতে ঘড়ি দেখে নিজের অগ্রগতি যাচাই করুন।
- **সহজ প্রশ্ন আগে:** পুরো প্রশ্নপত্রে একবার চোখ বুলিয়ে যেসব প্রশ্নের উত্তর সঙ্গে সঙ্গে জানা আছে, সেগুলো আগে সম্পন্ন করুন — এতে আত্মবিশ্বাস বাড়ে এবং কঠিন প্রশ্নের জন্য বেশি সময় থাকে।
- **অপশন বাদ দেওয়ার কৌশল (elimination method):** সরাসরি উত্তর মনে না এলে প্রথমে সুস্পষ্টভাবে ভুল অপশনগুলো বাদ দিন — এতে অবশিষ্ট অপশনগুলোর মধ্যে থেকে সঠিক উত্তর অনুমান করার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায়।
- **অজানা প্রশ্নে সময় নষ্ট না করা:** কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর একেবারেই না জানা থাকলে তাতে দীর্ঘ সময় আটকে না থেকে চিহ্নিত করে পরের প্রশ্নে চলে যান, পরে সময় থাকলে আবার ফিরে আসুন।
- **নেগেটিভ মার্কিং সম্পর্কে সচেতনতা:** যেসব পরীক্ষায় ভুল উত্তরের জন্য নম্বর কাটা যায়, সেখানে সম্পূর্ণ অনিশ্চিত প্রশ্নে দৈবক্রমে উত্তর না দিয়ে বরং যুক্তিসংগত অনুমানের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিন।
- **উত্তরপত্র পূরণে সতর্কতা:** উত্তর নির্বাচনের সঙ্গে সঙ্গে উত্তরপত্রে সঠিক ক্রমিক নম্বরে চিহ্ন দেওয়া নিশ্চিত করুন, কারণ একটি প্রশ্ন এলোমেলো হয়ে গেলে পরবর্তী সবগুলো উত্তরও ভুল জায়গায় পড়ে যেতে পারে।
- **শেষ কয়েক মিনিট পর্যালোচনার জন্য রাখা:** হাতে থাকা শেষ কয়েক মিনিট নতুন কোনো কঠিন প্রশ্নে ব্যয় না করে ইতিমধ্যে দেওয়া উত্তরগুলো দ্রুত পর্যালোচনা করার জন্য ব্যবহার করুন।
- **মানসিক স্থিরতা বজায় রাখা:** কোনো একটি অংশ কঠিন মনে হলেও ঘাবড়ে না গিয়ে মনে রাখুন যে পুরো প্রশ্নপত্রের অন্য অংশগুলোতেও সমান সুযোগ রয়েছে নম্বর তোলায়।

⚠️ প্রস্তুতির সময় প্রার্থীরা যেসব ভুল করেন

অনেক প্রার্থী শুধু মুখস্থবিদ্যার ওপর নির্ভর করে নিয়ম না বুঝেই এগিয়ে যান, ফলে পরীক্ষায় নতুন ধরনের প্রশ্ন এলে আটকে যান। আরেকটি সাধারণ ভুল হলো শুধু সাহিত্য বা শুধু ব্যাকরণ — যেকোনো একটি অংশে অতিরিক্ত সময় ব্যয় করা এবং অন্য অংশ অবহেলা করা, যা সামগ্রিক ফলাফলে ভারসাম্যহীনতা তৈরি করে। এ ছাড়া অনেকে অনুশীলনী বা পূর্ববর্তী বছরের প্রশ্ন সমাধান না করেই শুধু তত্ত্ব পড়ে প্রস্তুতি শেষ মনে করেন, অথচ বাস্তব প্রশ্নের ধরনের সঙ্গে পরিচিত না হলে হলে গিয়ে সময় ব্যবস্থাপনায় সমস্যা হয়। এই বইয়ের প্রতিটি অধ্যায়ে তত্ত্ব ও প্রয়োগ — উভয়ের ওপর সমান জোর দেওয়া হয়েছে, যাতে এই সাধারণ ভুলগুলো এড়ানো যায়।

১.৪.১ পরীক্ষার ঠিক আগের সময়টুকু কীভাবে কাজে লাগাবেন

পরীক্ষার ঠিক আগের দিনগুলোতে নতুন কোনো অধ্যায় শুরু না করে ইতিমধ্যে পড়া অংশগুলো ঝালিয়ে নেওয়াই সবচেয়ে বুদ্ধিমান কৌশল। এই সময়টুকুতে কয়েকটি বিষয় বিশেষভাবে খেয়াল রাখা যেতে পারে —

- প্রতিটি অধ্যায়ের শর্টকাট কৌশল ও সাধারণ ভুল বক্সগুলো দ্রুত একবার পুনরায় দেখে নিন, কারণ এগুলোতেই সবচেয়ে ঘনীভূতভাবে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংকলিত থাকে।
- চূড়ান্ত রিভিশন অধ্যায়ে সংকলিত সংক্ষিপ্তসারগুলো একাধিকবার চোখ বুলিয়ে দেখুন, যাতে পুরো বইয়ের মূল বিষয়গুলো একসঙ্গে মনে ঝালিয়ে নেওয়া যায়।
- আগে সমাধান করা অনুশীলনী প্রশ্নগুলো আরেকবার দ্রুত সমাধান করে দেখুন — একই ভুল আবার হচ্ছে কি না, তা যাচাই করার এটিই সবচেয়ে ভালো উপায়।
- রাত জেগে নতুন কিছু মুখস্থ করার চেষ্টা না করে পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিন, কারণ পরীক্ষার হলে মনোযোগ ও স্থিরতা বজায় রাখার জন্য বিশ্রামও প্রস্তুতির একটি অপরিহার্য অংশ।
- প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও লেখার সরঞ্জাম আগের রাতেই গুছিয়ে রাখুন, যাতে পরীক্ষার দিন সকালে অহেতুক তাড়াহুড়া বা মানসিক চাপ তৈরি না হয়।
- পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছানোর পথ ও সময় আগে থেকেই পরিকল্পনা করে রাখুন, যাতে দেরি হওয়ার আশঙ্কা নিয়ে বাড়তি উদ্বেগে প্রস্তুতির শেষ মুহূর্তগুলো নষ্ট না হয়।

সবশেষে মনে রাখা জরুরি, ধারাবাহিকতাই বাংলা প্রস্তুতির সবচেয়ে বড় শক্তি — প্রতিদিন অল্প সময় হলেও নিয়মিত চর্চা করলে যে ফল পাওয়া যায়, তা একবারে অনেক সময় ব্যয় করে অনিয়মিতভাবে পড়াশোনা করলে পাওয়া যায় না। এই বইয়ের প্রতিটি অধ্যায় এমনভাবে সাজানো হয়েছে, যাতে সংজ্ঞা ও নিয়ম বোঝার পাশাপাশি বাস্তব পরীক্ষায় আসা প্রশ্ন দিয়ে সেই জ্ঞান যাচাই করা যায়। এখন সময় হয়েছে যাত্রা শুরু করার — পরবর্তী অধ্যায় থেকেই আমরা প্রবেশ করব বাংলা ব্যাকরণের একেবারে গোড়ার পাঠে, যেখানে আলোচিত হবে ধ্বনি কী, বাংলা বর্ণমালার গঠন কেমন এবং উচ্চারণের মৌলিক নিয়মগুলো কী — যা সামনের প্রতিটি অধ্যায়ের ভিত্তি হয়ে দাঁড়াবে।



বাংলা ব্যাকরণ: মৌলিক অংশ

সরকারি ও বেসরকারি চাকরির প্রস্তুতি

ধ্বনিতত্ত্ব ও বর্ণ পরিচয়

ভাষার সবচেয়ে ক্ষুদ্র উপাদান হলো ধ্বনি, আর সেই ধ্বনিগুলো নিয়েই গড়ে ওঠে শব্দ, বাক্য এবং শেষ পর্যন্ত সমগ্র ভাষা। তাই বাংলা ব্যাকরণের যেকোনো আলোচনা শুরু করতে হলে প্রথমেই ফিরে যেতে হয় ধ্বনি ও বর্ণের এই মৌলিক জগতে। এই অধ্যায়টি নিছক একটি সূচনা-পাঠ নয় — বরং এটি পুরো বাংলা ব্যাকরণের ভিত্তি। সন্ধির নিয়ম বোঝার জন্য যেমন স্বরধ্বনি-ব্যঞ্জনধ্বনির শ্রেণিবিভাগ জানা আবশ্যিক, তেমনি গত-ষত্ব বিধান, উচ্চারণের শুদ্ধতা যাচাই কিংবা শুদ্ধ বানান নির্ণয়ের মতো প্রায় প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের গোড়ার কথাই লুকিয়ে থাকে ধ্বনিতত্ত্বে। যে শিক্ষার্থী উচ্চারণস্থান, ঘোষ-অঘোষ কিংবা মহাপ্রাণ-অল্পপ্রাণের পার্থক্য স্পষ্টভাবে বোঝেন, তিনি পরবর্তী প্রতিটি অধ্যায়ে অনেক সহজে এগিয়ে যেতে পারেন — কারণ তখন প্রতিটি নিয়মই তাঁর কাছে যুক্তিগ্রাহ্য মনে হয়, নিছক মুখস্থবিদ্যা নয়। এই অধ্যায়ে ধ্বনি ও বর্ণের পার্থক্য থেকে শুরু করে স্বরধ্বনি-ব্যঞ্জনধ্বনির সম্পূর্ণ শ্রেণিবিভাগ, উচ্চারণস্থান, ঘোষ-অঘোষ ও মহাপ্রাণ-অল্পপ্রাণ বিধান এবং যুক্তব্যঞ্জন-সংক্রান্ত উচ্চারণের নিয়ম পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হলো।

২.১ ধ্বনি ও বর্ণের পার্থক্য

ভাষা প্রথমত ও প্রধানত মুখের বিষয় — মানুষ প্রথমে কথা বলতে শেখে, তারপর সেই কথাকে ধরে রাখার জন্য লিখতে শেখে। মুখ দিয়ে উচ্চারিত, কানে শোনা যায় এমন সর্বনিম্ন ভাষিক এককের নাম **ধ্বনি**। আর সেই ধ্বনিকে চোখে দেখা যায় এমনভাবে ধরে রাখার জন্য ব্যবহৃত লিখিত চিহ্ন বা প্রতীকের নাম **বর্ণ**। সহজ কথায়, ধ্বনি হলো শোনার বিষয়, বর্ণ হলো দেখার বিষয়। একটি ধ্বনি বাতাসে ভেসে মুহূর্তেই মিলিয়ে যায়, কিন্তু বর্ণ কাগজে বা পর্দায় স্থায়ীভাবে থেকে যায় — এই স্থায়িত্ব দেওয়াই বর্ণের কাজ।

এই দুটি ধারণা কাছাকাছি মনে হলেও এক নয়, এবং পরীক্ষায় প্রায়ই এই সূক্ষ্ম পার্থক্যটি নিয়ে প্রশ্ন আসে। লক্ষণীয় বিষয় হলো, একটি ভাষায় ধ্বনির সংখ্যা আর সেই ভাষা লেখার জন্য ব্যবহৃত বর্ণের সংখ্যা সবসময় সমান হয় না। যেমন, বাংলা লিপিতে দীর্ঘ ঐ এবং হ্রস্ব ই — এই দুটি সম্পূর্ণ আলাদা বর্ণ হিসেবে লেখা হলেও প্রমিত বাংলা উচ্চারণে দুটির ধ্বনিগত কোনো পার্থক্য নেই; দুটোই একই রকম উচ্চারিত হয়। একইভাবে উ ও ঊ-এর উচ্চারণেও কোনো ভেদ নেই। অর্থাৎ এখানে বর্ণ দুটি হলেও ধ্বনি একটিই। এই দৃষ্টান্ত থেকেই স্পষ্ট হয় যে বানান-নির্ভর বর্ণবিচার আর উচ্চারণ-নির্ভর ধ্বনিবিচার — দুটি ভিন্ন স্তরের আলোচনা, এবং ব্যাকরণে ধ্বনি নিয়ে যে শাখায় আলোচনা করা হয় তার নাম **ধ্বনিতত্ত্ব**, যেখানে সন্ধি, ধ্বনি পরিবর্তন, ষত্ব-গত্ব বিধানের মতো বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকে।

✓ ধ্বনি বনাম বর্ণ

ই ও ঐ — দুটি ভিন্ন বর্ণ, কিন্তু উচ্চারণে একই ধ্বনি।

উ ও ঊ — দুটি ভিন্ন বর্ণ, কিন্তু উচ্চারণে একই ধ্বনি।

'বন্ধন' শব্দটি লেখায় ছয়টি বর্ণ নিয়ে গঠিত হলেও উচ্চারণের সময় এটি দুটি স্বল্পতম প্রয়াসের ধ্বনিগুচ্ছে বিভক্ত হয় — বন্ ও ধন্; বাগযন্ত্রের এই স্বল্পতম উচ্চারণ-প্রয়াসকে বলা হয় **অক্ষর** (ইংরেজিতে syllable), যা ধ্বনি ও বর্ণের চেয়ে ভিন্ন আরেকটি একক।

অক্ষরের ধারণাটি আরও একটু বিস্তারিতভাবে বোঝা দরকার, কারণ এটি প্রায়ই ধ্বনি ও বর্ণের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা হয়। একটি অক্ষর যদি কোনো স্বরধ্বনি দিয়ে শেষ হয়, তবে তাকে **মুক্তাঙ্গর** বলে (যেমন 'তা-রা' শব্দের 'তা' ও 'রা' — দুটিই স্বরধ্বনিতে শেষ হয়েছে), আর যদি কোনো ব্যঞ্জনধ্বনি দিয়ে শেষ হয়, তবে তাকে **বন্ধাঙ্গর** বলে (যেমন 'বন্ধন' শব্দের 'বন্' ও 'ধন্' — দুটিই ব্যঞ্জনধ্বনিতে শেষ হয়েছে)। এই মুক্তাঙ্গর-বন্ধাঙ্গরের পার্থক্য পরবর্তীকালে ছন্দ-অলংকার সংক্রান্ত আলোচনাতেও কাজে লাগে, তাই শুরুতেই এই ধারণাটি স্পষ্ট রাখা ভালো।

ধ্বনি উৎপন্ন হয় **বাগযন্ত্রের** সমন্বিত কাজের মাধ্যমে। ফুসফুস থেকে ঠেলে দেওয়া বাতাস স্বরযন্ত্র, জিহ্বা, তালু, দাঁত, মাড়ি, ঠোঁট ও নাসিকা-গহ্বরের বিভিন্ন অংশ অতিক্রম করার সময় বাধাপ্রাপ্ত বা অবাধ হয়ে বিভিন্ন ধরনের ধ্বনিতে রূপ নেয়। এই সম্পূর্ণ প্রত্যঙ্গসমষ্টিকেই একত্রে বাগযন্ত্র বলা হয়, আর একেকটি ধ্বনির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নির্ধারিত হয় বাগযন্ত্রের ঠিক কোন অংশে এবং কীভাবে বাতাসের প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে তার উপর ভিত্তি করে। পরবর্তী বিভাগগুলোতে এই বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতেই ধ্বনিগুলোর শ্রেণিবিভাগ আলোচনা করা হয়েছে।

বাংলা লিপির নিজস্ব একটি সুপ্রাচীন ইতিহাসও আছে। বাংলা বর্ণমালার উদ্ভব ঘটেছে প্রাচীন ভারতীয় **ব্রাহ্মী লিপি** থেকে — ব্রাহ্মী লিপির পূর্বাঞ্চলীয় শাখা কুটিল লিপির ধারাবাহিকতায় ধীরে ধীরে বাংলা লিপি তার বর্তমান রূপ লাভ করে। বর্তমানে বাংলা বর্ণমালায় মোট ৫০টি বর্ণ আছে — স্বরবর্ণ ১১টি ও ব্যঞ্জনবর্ণ ৩৯টি — যাদের বিস্তারিত শ্রেণিবিভাগ পরের বিভাগে আলোচনা করা হলো।

এ ছাড়া বাংলা লিপিতে এমন কয়েকটি চিহ্ন আছে যাদের নিজস্ব কোনো স্বাধীন উচ্চারণ নেই, বরং পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির সহায়তা ছাড়া এগুলো উচ্চারণই করা যায় না। এই ধরনের বর্ণকে বলা হয় **পর্যায়ী বর্ণ**। যেমন বিসর্গ (ঃ) কোনো স্বাধীন ধ্বনি বহন করে না, বরং তার ঠিক আগের স্বরধ্বনির উপর ভর করেই উচ্চারিত হয় (যেমন 'দুঃখ'-এ উঃ-ধ্বনির রেশ)। অনুস্বার (ং) ও চন্দ্রবিন্দু (ঁ)-ও একই ধরনের বৈশিষ্ট্যের অধিকারী বলে গণ্য করা হয়, কারণ এরাও পূর্ববর্তী স্বরধ্বনি ছাড়া নিজে থেকে উচ্চারিত হতে পারে না।

❗ ধ্বনি ও বর্ণ গুলিয়ে ফেলবেন না

পরীক্ষায় প্রায়ই এমন প্রশ্ন আসে যেখানে আপাতদৃষ্টিতে বর্ণ গণনা করলে এক উত্তর আসে, কিন্তু ধ্বনি গণনা করলে অন্য উত্তর আসে। দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার সহজ কৌশল হলো নিজেকে প্রশ্ন করা — প্রশ্নে কি লেখা রূপ (বানান/হরফ) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, নাকি মুখের উচ্চারণ সম্পর্কে? প্রশ্নে 'বর্ণ', 'হরফ' বা 'বানান' শব্দ থাকলে লেখ্য রূপ অনুযায়ী উত্তর দিতে হবে; আর 'ধ্বনি' বা 'উচ্চারণ' শব্দ থাকলে মুখের প্রকৃত উচ্চারণ অনুযায়ী উত্তর দিতে হবে।

২.২ স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি

উৎপত্তির প্রকৃতি অনুযায়ী ধ্বনিকে দুই প্রধান শ্রেণিতে ভাগ করা হয় — স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি। যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় ফুসফুসের বাতাস মুখগহ্বরের কোথাও বাধাপ্রাপ্ত না হয়ে অবাধে বেরিয়ে আসে এবং যাকে অন্য কোনো ধ্বনির সহায়তা ছাড়াই স্বাধীনভাবে উচ্চারণ করা যায়, তাকে **স্বরধ্বনি** বলে। অন্যদিকে যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় বাতাসের প্রবাহ মুখগহ্বরের কোনো না কোনো স্থানে আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়, এবং যাকে স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করতে সাধারণত একটি স্বরধ্বনির সহায়তা প্রয়োজন হয়, তাকে **ব্যঞ্জনধ্বনি** বলে।

২.২.১ স্বরধ্বনি

সরকারি ও বেসরকারি চাকরির প্রস্তুতি

লিখিত রূপে বাংলায় স্বরবর্ণ ১১টি — অ, আ, ই, ঐ, উ, ঊ, ঋ, এ, ঐ, ও, ঔ। তবে এই ১১টি সংখ্যাটি মূলত **বর্ণের** সংখ্যা, প্রকৃত স্বতন্ত্র **ধ্বনির** সংখ্যা এর চেয়ে কম। এর কারণ আগের বিভাগেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে — ই ও ঐ-এর উচ্চারণ অভিন্ন, উ ও ঊ-এর উচ্চারণও অভিন্ন; শুধু বানানের প্রয়োজনে দুটি করে ভিন্ন বর্ণ ব্যবহৃত হয়। ফলে প্রমিত বাংলায় সত্যিকারের স্বতন্ত্র **মৌলিক স্বরধ্বনি** সাতটি — অ, আ, ই, ঊ, এ, ও এবং অ্যা (যেমন 'এত', 'ব্যাকরণ' শব্দের উচ্চারণে শোনা যায়, যদিও এর জন্য আলাদা কোনো বর্ণ নেই)।

এই সাতটি মৌলিক ধ্বনির বাইরে ঐ ও ঔ-কে বলা হয় **যোগিক স্বরধ্বনি** বা দ্বিস্বরধ্বনি, কারণ উচ্চারণের সময় এগুলো আসলে দুটি করে স্বরধ্বনির দ্রুত ও মসৃণ মিলন — ঐ প্রকৃতপক্ষে ও+ই এবং ঔ প্রকৃতপক্ষে ও+ঊ ধ্বনির সংযুক্ত রূপ। আর ঋ বর্ণটি ধ্বনিগতভাবে প্রকৃত অর্থে কোনো বিশুদ্ধ স্বরধ্বনি নয়, বরং এটি ব্যঞ্জন ও স্বরধ্বনির মিশ্র উচ্চারণ 'রি'-র প্রতিনিধিত্ব করে (যেমন 'ঋষি' উচ্চারিত হয় 'রিশি')। এই কারণেই কোনো প্রশ্নে 'মূল/মৌলিক ধ্বনি নয় কোনটি' জিজ্ঞাসা করা হলে ঐ, ঔ বা ঋ-এর মতো বর্ণগুলোই সাধারণত সঠিক উত্তর হয়ে থাকে।

❗ মৌলিক ও যোগিক স্বরধ্বনি চেনার সহজ উপায়

কোনো স্বরধ্বনি মৌলিক নাকি যোগিক তা নির্ণয়ের সহজ পরীক্ষা হলো — ধ্বনিটিকে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করে দেখা এর মধ্যে দুটি ভিন্ন স্বরের আভাস পাওয়া যায় কি না। 'ও' ধীরে উচ্চারণ করলে একটিমাত্র অবিচ্ছিন্ন ধ্বনি শোনা যায়, কিন্তু 'ঐ' ধীরে উচ্চারণ করলে প্রথমে 'ও' এবং শেষে 'ই'-এর আভাস স্পষ্ট শোনা যায় — এটিই যোগিক স্বরধ্বনির লক্ষণ। এই সহজ কৌশলে অ, আ, ই, ঊ, এ, ও-কে মৌলিক এবং ঐ, ঔ-কে যোগিক হিসেবে দ্রুত চিহ্নিত করা যায়।

২.২.২ ব্যঞ্জনধ্বনি

বাংলায় ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যা ৩৯টি। উচ্চারণের ধরন ও উৎপত্তিস্থল বিবেচনায় এই ৩৯টি ব্যঞ্জনধ্বনিকে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। প্রথম পাঁচটি ধ্বনি পাঁচটি **বর্গে** বিভক্ত — প্রতিটি বর্গে পাঁচটি করে ধ্বনি থাকে এবং প্রতিটি ধ্বনির উচ্চারণে বাতাসের পথ মুখগহ্বরের একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায় বলে এদের **স্পর্শধ্বনি**ও বলা হয়। বর্গভুক্ত ধ্বনির বাইরে আরও দুটি শ্রেণি আছে — অন্তঃস্থ ধ্বনি ও উষ্মধ্বনি, যাদের উচ্চারণে বাতাসের পথ সম্পূর্ণ বন্ধ না হয়ে আংশিক সংকুচিত থাকে। আর অবশিষ্ট কয়েকটি বর্ণ কোনো বর্গের অন্তর্ভুক্ত না হয়েও বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণমালার অংশ। নিচের সারণিতে সম্পূর্ণ শ্রেণিবিভাগ একনজরে দেখানো হলো —

শ্রেণি	বর্ণ	সংখ্যা	উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য
ক-বর্গ স্পর্শধ্বনি)	(কণ্ঠ্য) ক খ গ ঘ ঙ	৫টি	জিহ্বামূল কণ্ঠনালীর নিকটবর্তী অংশ স্পর্শ করে বাতাসের পথ বন্ধ করে উচ্চারিত হয়।
চ-বর্গ স্পর্শধ্বনি)	(তালব্য) চ ছ জ ঝ ঞ	৫টি	জিহ্বার সম্মুখভাগ শক্ত তালুতে স্পর্শ করে উচ্চারিত হয়।
ট-বর্গ স্পর্শধ্বনি)	(মূর্ধন্য) ট ঠ ড ঢ ণ	৫টি	জিহ্বাগ্র উল্টে তালুর ঊর্ধ্বাংশ (মূর্ধা) স্পর্শ করে উচ্চারিত হয়।
ত-বর্গ স্পর্শধ্বনি)	(দন্ত্য) ত থ দ ধ ন	৫টি	জিহ্বাগ্র উপরের পাটির দাঁতের গোড়ায় স্পর্শ করে উচ্চারিত হয়।
প-বর্গ স্পর্শধ্বনি)	(ওষ্ঠ্য) প ফ ব ভ ম	৫টি	দুই ঠোঁট পরস্পর স্পর্শ করে বাতাসের পথ বন্ধ করে উচ্চারিত হয়।
অন্তঃস্থ ধ্বনি	য র ল ব	৪টি	স্বরধ্বনি ও স্পর্শধ্বনির মধ্যবর্তী চরিত্রের; বাতাসের পথ পুরোপুরি বন্ধ না হয়ে আংশিক রুদ্ধ থাকে।
উষ্মধ্বনি	শ ষ স হ	৪টি	বাতাসের পথ সম্পূর্ণ বন্ধ না হয়ে সংকুচিত থাকে, ফলে ঘষণজনিত শোঁ-শোঁ শব্দ তৈরি হয়।
অতিরিক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ	ড় ঢ় ঞ ৎ ঞ ঃ	৬টি	নির্দিষ্ট বর্গভুক্ত না হয়েও বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণমালার অন্তর্ভুক্ত, মোট ৩৯টি ব্যঞ্জনবর্ণ পূর্ণ করে।

🔗 বর্গের ক্রম মনে রাখার শর্টকাট

পাঁচটি বর্গের ক্রম (কণ্ঠ্য → তালব্য → মূর্ধন্য → দন্ত্য → ওষ্ঠ্য) মনে রাখার সবচেয়ে জনপ্রিয় ও কার্যকর কৌশল হলো প্রতিটি বর্গের প্রথম ধ্বনিটি ধারাবাহিকভাবে মনে রাখা — **ক চ ট ত প**। মুখের ভেতরে সবচেয়ে গভীর (গলার কাছে) স্থান থেকে শুরু করে সবচেয়ে সম্মুখের (ঠোঁটের) স্থান পর্যন্ত ধাপে ধাপে এগিয়ে যাওয়ার ক্রমেই এই পাঁচটি অক্ষর সাজানো — অর্থাৎ 'ক চ ট ত প' একবার মুখস্থ থাকলে বর্গের ক্রম ও প্রতিটি বর্গের উচ্চারণস্থান দুটোই একসঙ্গে মনে করা সহজ হয়ে যায়।

২.৩ উচ্চারণস্থান অনুযায়ী ব্যঞ্জনধ্বনির শ্রেণিবিভাগ

আগের সারণিতে যে পাঁচটি বর্ণ ও দুটি অতিরিক্ত শ্রেণি দেখানো হয়েছে, তাদের প্রতিটির নামকরণই আসলে হয়েছে মুখগহ্বরের ঠিক কোন অংশে জিহ্বা স্পর্শ করে ধ্বনিটি উৎপন্ন হচ্ছে তার ভিত্তিতে। এই স্থানকে বলা হয় ধ্বনির **উচ্চারণস্থান**। মুখগহ্বরের পেছন থেকে সামনের দিকে ক্রমানুসারে পাঁচটি প্রধান উচ্চারণস্থান রয়েছে —

কণ্ঠ্য: জিহ্বামূল কণ্ঠনালীর কাছাকাছি অংশে গিয়ে স্পর্শ করলে যে ধ্বনি উৎপন্ন হয় তাকে কণ্ঠ্যধ্বনি বলে। ক-বর্ণের পাঁচটি ধ্বনি (ক খ গ ঘ ঙ) ছাড়াও বিসর্গ (ঃ) এবং হ-ধ্বনিকে কণ্ঠ্য ধ্বনির অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

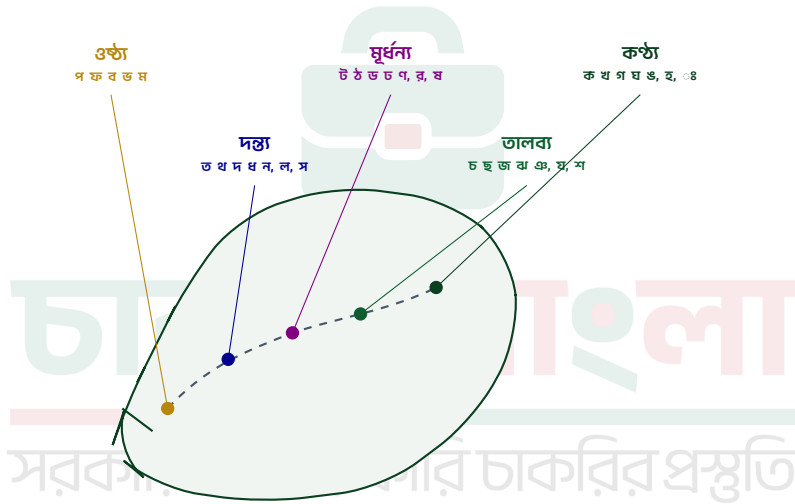
তালব্য: জিহ্বার সম্মুখভাগ শক্ত তালুতে স্পর্শ করলে যে ধ্বনি উৎপন্ন হয় তাকে তালব্যধ্বনি বলে। চ-বর্ণের পাঁচটি ধ্বনি (চ ছ জ ঝ ঞ) ছাড়াও য এবং শ-ধ্বনিকে তালব্য ধ্বনি হিসেবে গণ্য করা হয়।

মূর্ধন্য: জিহ্বাগ্র পেছনে বাঁকিয়ে তালুর ঊর্ধ্বাংশ বা মূর্ধায় স্পর্শ করলে যে ধ্বনি উৎপন্ন হয় তাকে মূর্ধন্যধ্বনি বলে। ট-বর্ণের পাঁচটি ধ্বনি (ট ঠ ড ঢ ণ) ছাড়াও র এবং ষ-ধ্বনিকে মূর্ধন্য ধ্বনি হিসেবে ধরা হয়।

দন্ত্য: জিহ্বাগ্র উপরের পাটির দাঁতের গোড়ায় স্পর্শ করলে যে ধ্বনি উৎপন্ন হয় তাকে দন্ত্যধ্বনি বলে। ত-বর্ণের পাঁচটি ধ্বনি (ত থ দ ধ ন) ছাড়াও ল এবং স-ধ্বনিকে দন্ত্য ধ্বনি হিসেবে গণ্য করা হয়।

ওষ্ঠ্য: দুই ঠোঁট পরস্পর স্পর্শ করলে যে ধ্বনি উৎপন্ন হয় তাকে ওষ্ঠ্যধ্বনি বলে। প-বর্ণের পাঁচটি ধ্বনি (প ফ ব ভ ম) এই শ্রেণির প্রতিনিধি; এ ছাড়া ব-ধ্বনিকে কখনো কখনো ওষ্ঠ্য-দন্তমূলীয় হিসেবেও উল্লেখ করা হয়।

নিচের চিত্রে মুখগহ্বরের একটি সরলীকৃত পার্শ্বদৃশ্যে এই পাঁচটি উচ্চারণস্থান এবং প্রতিটি স্থানে উচ্চারিত ধ্বনিগুলো একসঙ্গে দেখানো হলো, যা সামনের (ঠোঁটের কাছের) অবস্থান থেকে পেছনের (গলার কাছের) অবস্থান পর্যন্ত ক্রমানুসারে সাজানো —



চিত্রে দেখানো ড্যাশ-চিহ্নিত রেখাটি মুখগহ্বরের ছাদ বরাবর সামনে থেকে পেছনে যাওয়ার পথ নির্দেশ করছে — সবচেয়ে সামনে ঠোঁটের অবস্থান (ওষ্ঠ্য), তারপর ক্রমান্বয়ে দাঁত (দন্ত্য), মূর্ধা (মূর্ধন্য), শক্ত তালু (তালব্য) এবং সবশেষে গলার কাছাকাছি অবস্থান (কণ্ঠ্য)। কোনো ধ্বনি উচ্চারণের সময় মুখের ভেতরে জিহ্বার স্পর্শবিন্দুটি অনুভব করার চেষ্টা করলে এই পাঁচটি স্থান বাস্তবে খুব সহজেই আলাদা করে চেনা যায়।

✓ উচ্চারণস্থান চেনার দৃষ্টান্ত

‘কলম’ শব্দ ধীরে উচ্চারণ করলে ক-ধ্বনির সময় জিহ্বামূল গলার দিকে সরে যায় — এটি কণ্ঠ্যধ্বনি।

‘চাঁদ’ শব্দের চ-ধ্বনি উচ্চারণের সময় জিহ্বার সামনের অংশ তালুতে ঠেকে — এটি তালব্যধ্বনি।

‘টমেটো’ শব্দের ট-ধ্বনি উচ্চারণের সময় জিহ্বাগ্র বেঁকে মূর্ধায় স্পর্শ করে — এটি মূর্ধন্যধ্বনি।

‘তারা’ শব্দের ত-ধ্বনি উচ্চারণের সময় জিহ্বাগ্র দাঁতের গোড়ায় ঠেকে — এটি দন্ত্যধ্বনি।

‘পাখি’ শব্দের প-ধ্বনি উচ্চারণের সময় দুই ঠোঁট পরস্পর স্পর্শ করে — এটি ওষ্ঠ্যধ্বনি।

⚠ সাধারণ ভুল

অনেক শিক্ষার্থী ণ এবং ন-এর উচ্চারণস্থান গুলিয়ে ফেলেন — মনে রাখা জরুরি, ণ মূর্ধন্য (ট-বর্ণের সদস্য) আর ন দন্ত্য (ত-বর্ণের সদস্য), যদিও বাংলার প্রমিত উচ্চারণে দুটির ধ্বনিগত পার্থক্য খুব সূক্ষ্ম শোনায়। একইভাবে ষ ও স-এর

উচ্চারণস্থানও গুলিয়ে ফেলা একটি সাধারণ ভুল — স্বমূর্ধন্য, আর স দন্ত্য। আরেকটি প্রচলিত বিভ্রান্তি হলো ব-ফলা ও ব-ধ্বনিকে এক ভাবা; উচ্চারণস্থান বিচারে ব ওষ্ঠ্যধ্বনি হলেও সংযুক্ত অবস্থায় (ফলা হিসেবে) এর উচ্চারণ শব্দভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপ নিতে পারে।

২.৪ ঘোষ-অঘোষ ও মহাপ্রাণ-অল্পপ্রাণ ধ্বনি

উচ্চারণস্থানের পাশাপাশি ব্যঞ্জনধ্বনির আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য আছে, যেগুলো সন্ধি ও গত্ব-ষত্ব বিধানের মতো অধ্যায়ের নিয়মগুলো বোঝার সরাসরি ভিত্তি তৈরি করে — এই দুটি হলো ঘোষত্ব ও মহাপ্রাণত্ব।

কোনো ধ্বনি উচ্চারণের সময় গলার স্বরতন্ত্রীদ্বয় (vocal cords) কম্পিত হলে তাকে **ঘোষ ধ্বনি** বলে, আর স্বরতন্ত্রী কম্পিত না হলে তাকে **অঘোষ ধ্বনি** বলে। হাতের আঙুল গলার সামনের দিকে (স্বরযন্ত্রের কাছে) রেখে ধ্বনিটি উচ্চারণ করলে ঘোষ ধ্বনির ক্ষেত্রে একটি স্পষ্ট কম্পন অনুভূত হয়, অঘোষ ধ্বনির ক্ষেত্রে তা অনুভূত হয় না। সব স্বরধ্বনিই স্বভাবতই ঘোষ ধ্বনি। ব্যঞ্জনধ্বনির মধ্যে প্রতিটি বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় ধ্বনি (যেমন ক-বর্গে ক ও খ) অঘোষ, আর তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম ধ্বনি (যেমন ক-বর্গে গ, ঘ ও ঙ) ঘোষ।

অন্যদিকে, কোনো ধ্বনি উচ্চারণের সময় ফুসফুস থেকে অপেক্ষাকৃত বেশি বাতাসের ঝাপটা বেরিয়ে এলে তাকে **মহাপ্রাণ ধ্বনি** বলে, আর অপেক্ষাকৃত কম বাতাস ব্যবহৃত হলে তাকে **অল্পপ্রাণ ধ্বনি** বলে। প্রতিটি বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ ধ্বনি (যেমন ক-বর্গে খ ও ঘ) মহাপ্রাণ, আর প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম ধ্বনি (যেমন ক-বর্গে ক, গ ও ঙ) অল্পপ্রাণ। এই দুটি বৈশিষ্ট্য মিলিয়ে দেখলে একেকটি বর্গের পাঁচটি ধ্বনির একটি সুস্পষ্ট চতুর্মাত্রিক বিন্যাস পাওয়া যায় —

✓ পাঁচটি বর্গেই ঘোষ-অঘোষ ও মহাপ্রাণ-অল্পপ্রাণের অভিন্ন বিন্যাস

ক-বর্গ: ক (অঘোষ-অল্পপ্রাণ), খ (অঘোষ-মহাপ্রাণ), গ (ঘোষ-অল্পপ্রাণ), ঘ (ঘোষ-মহাপ্রাণ), ঙ (ঘোষ-নাসিক্য)।

চ-বর্গ: চ (অঘোষ-অল্পপ্রাণ), ছ (অঘোষ-মহাপ্রাণ), জ (ঘোষ-অল্পপ্রাণ), ঝ (ঘোষ-মহাপ্রাণ), ঞ (ঘোষ-নাসিক্য)।

ট-বর্গ: ট (অঘোষ-অল্পপ্রাণ), ঠ (অঘোষ-মহাপ্রাণ), ড (ঘোষ-অল্পপ্রাণ), ঢ (ঘোষ-মহাপ্রাণ), ণ (ঘোষ-নাসিক্য)।

ত-বর্গ: ত (অঘোষ-অল্পপ্রাণ), থ (অঘোষ-মহাপ্রাণ), দ (ঘোষ-অল্পপ্রাণ), ধ (ঘোষ-মহাপ্রাণ), ন (ঘোষ-নাসিক্য)।

প-বর্গ: প (অঘোষ-অল্পপ্রাণ), ফ (অঘোষ-মহাপ্রাণ), ব (ঘোষ-অল্পপ্রাণ), ভ (ঘোষ-মহাপ্রাণ), ম (ঘোষ-নাসিক্য)।

লক্ষণীয়, পাঁচটি বর্গেই বিন্যাসের ধরন হুবহু অভিন্ন — ১ম ধ্বনি অঘোষ-অল্পপ্রাণ, ২য় ধ্বনি অঘোষ-মহাপ্রাণ, ৩য় ধ্বনি ঘোষ-অল্পপ্রাণ, ৪র্থ ধ্বনি ঘোষ-মহাপ্রাণ এবং ৫ম ধ্বনি সর্বদা ঘোষ ও নাসিক্য (অনুনাসিক)। এই একটিমাত্র বিন্যাস মুখস্থ থাকলে পাঁচটি বর্গের মোট পঁচিশটি ধ্বনিরই ঘোষত্ব ও মহাপ্রাণত্ব বলে দেওয়া সম্ভব।

📌 মহাপ্রাণ-অল্পপ্রাণ আলাদা করার সহজ পরীক্ষা

হাতের তালু মুখের সামনে কিছুটা দূরত্বে রেখে ধ্বনিটি জোরে উচ্চারণ করলেই মহাপ্রাণ ও অল্পপ্রাণের পার্থক্য সহজে বোঝা যায়। ‘খ’ উচ্চারণ করলে হাতের তালুতে বাতাসের স্পষ্ট ঝাপটা অনুভূত হবে (মহাপ্রাণ), কিন্তু ‘ক’ উচ্চারণ করলে সেই ঝাপটা অনেক কম বা প্রায় অনুভূত হবে না (অল্পপ্রাণ)। এই ছোট্ট শারীরিক পরীক্ষাটি বর্গের যেকোনো ধ্বনির ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা যায় এবং পরীক্ষার হলে মনে করার প্রয়োজন হলেও নীরবে চর্চা করা যায়।

এই ঘোষত্ব ও মহাপ্রাণত্বের ধারণা নিছক তাত্ত্বিক নয় — সন্ধির ব্যঞ্জনসন্ধি অংশে যে ঘোষীভবনের নিয়ম পড়ানো হয় (অঘোষ ধ্বনির পরে ঘোষ ধ্বনি এলে অঘোষ ধ্বনিটি ঘোষ ধ্বনিতে পরিণত হওয়া), তার সম্পূর্ণ ভিত্তিই এই শ্রেণিবিভাগ। তাই এই বিভাগের ধারণাগুলো স্পষ্টভাবে আয়ত্ত করা পরবর্তী অধ্যায়গুলোর জন্যও অপরিহার্য প্রস্তুতি হিসেবে কাজ করে।

২.৫ যুক্তব্যঞ্জন ও উচ্চারণের নিয়ম

২.৫.১ যুক্তব্যঞ্জন গঠনের নিয়ম

দুই বা ততোধিক ব্যঞ্জনধ্বনি মাঝখানে কোনো স্বরধ্বনির সহায়তা ছাড়াই পরপর উচ্চারিত হলে তাদের সেই মিলিত রূপকে **যুক্তব্যঞ্জন** বা যুক্তাক্ষর বলে। লেখার সময় এই যুক্তব্যঞ্জন বর্ণদুটিকে (বা তার বেশি হলে সবগুলোকে) একত্র করে একটি বিশেষ সংযুক্ত আকারে প্রকাশ করা হয় — যেমন ক্+ত=ক্ত (ভক্ত), ঙ্+ক=ঙ্ক (অঙ্ক), ন্+দ=ন্দ (বন্দনা)। যুক্তব্যঞ্জনের উচ্চারণ প্রায়শই তার উপাদান ধ্বনি দুটির নিছক পরপর উচ্চারণের চেয়ে খানিকটা আলাদা শোনায়, কারণ একটি ধ্বনি পরেরটির প্রভাবে সামান্য পরিবর্তিত হয়ে যায়। এই কারণেই যুক্তব্যঞ্জনের সঠিক উচ্চারণ ও তার উপাদান ধ্বনি চেনা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার একটি নিয়মিত প্রশ্নবিষয়।

২.৫.২ ফলাজনিত উচ্চারণ-পরিবর্তন

বাংলা বানানে কোনো ব্যঞ্জনবর্ণের নিচে বা পাশে অন্য একটি ব্যঞ্জনবর্ণ সংক্ষিপ্ত আকারে যুক্ত হলে তাকে **ফলা** বলে, আর ফলা যুক্ত হওয়ার ফলে মূল ধ্বনির উচ্চারণে প্রায়ই লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটে। তিনটি প্রধান ফলার প্রভাব বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ —

য-ফলা: পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের সঙ্গে য-ফলা যুক্ত হলে অনেক ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী অ-ধ্বনিটি অ্যা-ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়। যেমন 'ব্যাকরণ', 'ন্যায়' শব্দে ব্ ও ন্-এর পরের অ-ধ্বনি অ্যা-র মতো উচ্চারিত হয়।

ব-ফলা: ব-ফলা যুক্ত হলে উচ্চারণে তিন রকম প্রভাব দেখা যায় — কখনো পূর্ববর্তী ধ্বনি দ্বিত্ব হয়ে যায় (যেমন 'বিদ্বান'-এ দ্ব প্রায় দ্-এর মতো শোনায়), কখনো ব-ধ্বনি নিজে সামান্য শোনা যায় ('স্বাধীন'), আবার কখনো তা প্রায় নীরব থেকে যায়।

র-ফলা: র-ফলা যুক্ত হলে সাধারণত পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের পরপরই একটি র-ধ্বনির আভাস উচ্চারণে যুক্ত হয়। যেমন 'প্রিয়', 'ক্রম', 'গ্রাম' শব্দে প্, ক্, গ্-এর সঙ্গে র-ধ্বনির মিশ্রণ স্পষ্ট শোনা যায়।

✓ ফলাজনিত উচ্চারণ

কর্ম + য-ফলা প্রভাব: ব্যাকরণ (বহ্যাকরন-এর কাছাকাছি উচ্চারণ)।
বিদ্ + ব-ফলা প্রভাব: বিদ্বান (বিদ্দান-এর কাছাকাছি উচ্চারণ)।
প্ + র-ফলা প্রভাব: প্রিয় (পপ্রিয়ো নয়, প-এর সঙ্গে র মিশ্রিত হয়ে প্রিয়ো)।

২.৫.৩ ধ্বনি পরিবর্তনের সাধারণ নিয়ম

শব্দ উচ্চারণের সময় উচ্চারণ-সহজতার প্রয়োজনে মূল ধ্বনি প্রায়ই কিছুটা বদলে যায় — একেই বলা হয় **ধ্বনি পরিবর্তন**। প্রচলিত শ্রেণিবিভাগ অনুযায়ী ধ্বনি পরিবর্তনের চারটি প্রধান ধারা লক্ষ করা যায় —

১. স্বরাগম: শব্দে নতুন কোনো স্বরধ্বনির অতিরিক্ত সংযোজন। শব্দের শুরুতে যুক্ত হলে তাকে আদি স্বরাগম বলে (স্কুল > ইস্কুল), শব্দের মাঝখানে দুটি ব্যঞ্জনের মাঝে যুক্ত হলে তাকে মধ্য স্বরাগম বা বিপ্রকর্ষ বলে (রত্ন > রতন), আর শব্দের শেষে যুক্ত হলে তাকে অন্ত্য স্বরাগম বলে (বেঞ্চ > বেঞ্চি)।

২. স্বরলোপ: উচ্চারণের সময় শব্দের কোনো স্বরধ্বনি লোপ পাওয়া, বিশেষত দ্রুত ও কথ্য উচ্চারণে। যেমন 'করিতেছি' কথ্য উচ্চারণে সংক্ষিপ্ত হয়ে হয়ে যায় 'করছি', যেখানে মাঝের একাধিক স্বরধ্বনি লোপ পেয়েছে।

৩. ধ্বনি বিপর্যয়: শব্দের ভেতরে দুটি ধ্বনির পারস্পরিক স্থান বদল হয়ে যাওয়া। যেমন তৎসম 'পিচাচ' শব্দটি বাংলায় কথ্য রূপে অনেক সময় 'পিচাশ' রূপে উচ্চারিত হতে দেখা যায়, যেখানে শ ও চ-ধ্বনি দুটি নিজেদের স্থান বদল করেছে।

৪. সমীভবন: পাশাপাশি অবস্থিত দুটি ভিন্ন ধ্বনির একটি অন্যটির প্রভাবে বদলে গিয়ে উভয়ে একই রকম বা কাছাকাছি ধ্বনিতে পরিণত হওয়া। যেমন 'জন্ম' শব্দটি কথ্য উচ্চারণে প্রায়ই শোনা যায় 'জন্ম'-র মতো, যেখানে ন্-ধ্বনিটি পরের ম্-ধ্বনির প্রভাবে নিজেও ম্-এ পরিণত হয়েছে।

🏠 কোন পরীক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ

ধ্বনিতত্ত্ব ও বর্ণ পরিচয় অধ্যায় থেকে সাধারণত কয়েকটি নির্দিষ্ট ধরনের প্রশ্ন বারবার ফিরে আসে — স্বরবর্ণ-ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যা ও শ্রেণিবিভাগ, উচ্চারণস্থান অনুযায়ী কোন ধ্বনি কোন শ্রেণির তা শনাক্তকরণ, ঘোষ-অঘোষ বা মহাপ্রাণ-অল্পপ্রাণ ধ্বনি চেনা, মৌলিক না যৌগিক স্বরধ্বনি নির্ণয়, পূর্ণমাত্রা-অর্ধমাত্রা-মাত্রাহীন বর্ণের সংখ্যা, পরাশ্রয়ী বর্ণ চেনা এবং ধ্বনি পরিবর্তনের বিভিন্ন প্রকারভেদ। এই বিষয়গুলো একবার সুস্পষ্টভাবে আয়ত্ত করলে শুধু এই অধ্যায়ের প্রশ্নই

নয়, সন্ধি ও ধ্বনিসংক্রান্ত অন্যান্য অধ্যায়ের প্রশ্নেও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়, কারণ পরবর্তী প্রায় প্রতিটি নিয়মের ব্যাখ্যাই এই মৌলিক ধারণাগুলোর উপর দাঁড়িয়ে আছে।

সংক্ষেপে বলা যায়, ধ্বনিতত্ত্ব হলো বাংলা ব্যাকরণের প্রবেশদ্বার — এখানে শেখা ধ্বনি-বর্ণের পার্থক্য, স্বরধ্বনি-ব্যঞ্জনধ্বনির শ্রেণিবিভাগ, উচ্চারণস্থান এবং ঘোষ-অঘোষ ও মহাপ্রাণ-অল্পপ্রাণের ধারণা পরবর্তী প্রতিটি অধ্যায়ে বারবার কাজে লাগবে। তাই এই অধ্যায়ের নিয়মগুলো শুধু মুখস্থ না করে, প্রতিটি ধ্বনি নিজে উচ্চারণ করে তার উচ্চারণস্থান ও বৈশিষ্ট্য অনুভব করে বোঝার চেষ্টা করাই সবচেয়ে কার্যকর প্রস্তুতি। নিচের অনুশীলনীতে বাস্তব পরীক্ষায় আসা প্রশ্নগুলোর মাধ্যমে এই অধ্যায়ের ধারণাগুলো প্রয়োগ করে দেখা হলো।

২.৬ অনুশীলনী

১. বাংলা ব্যাকরণের ধ্বনিতত্ত্ব অংশে মূলত কোন বিষয়টি আলোচিত হয়?

(ক) সন্ধি (খ) সমাস (গ) কারক (ঘ) প্রত্যয়

উত্তর: (ক) সন্ধি

ব্যাখ্যা: ধ্বনিতত্ত্বে ধ্বনি, বর্ণ, উচ্চারণ প্রণালি, ধ্বনি পরিবর্তন, ষড়্-গত্ব বিধান ও সন্ধি আলোচিত হয়; সমাস, কারক ও প্রত্যয় রূপতত্ত্বের অন্তর্গত বিষয়, তাই এদের মধ্যে একমাত্র সন্ধিই ধ্বনিতত্ত্বের আলোচ্য।

[১২তম শিক্ষক নিবন্ধন (কলেজ পর্যায়)]

২. ভাষার সবচেয়ে ক্ষুদ্র একক হিসেবে সাধারণত কোনটি বিবেচিত হয়?

(ক) ধ্বনি (খ) বর্ণ (গ) অক্ষর (ঘ) শব্দ

উত্তর: (ক) ধ্বনি

ব্যাখ্যা: প্রচলিত উত্তরকুঞ্জ অনুযায়ী সঠিক উত্তর ধ্বনি, কারণ ধ্বনি সামগ্রিকভাবে ভাষার সবচেয়ে ক্ষুদ্র একক। তবে ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে বাক্যের অর্থবহ ক্ষুদ্রতম একক প্রকৃতপক্ষে শব্দ — ধ্বনি একা কোনো অর্থ বহন করে না, বরং কয়েকটি ধ্বনি মিলে অর্থপূর্ণ শব্দ গঠিত হয়।

[৬ষ্ঠ বিজেএস (বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস) প্রিলিমিনারি]

৩. বাগযন্ত্রের অংশ হিসেবে নিচের কোনটি বিবেচিত হয়?

(ক) স্বরযন্ত্র (খ) ফুসফুস (গ) দাঁত (ঘ) উপরের সবকটি

উত্তর: (ঘ) উপরের সবকটি

ব্যাখ্যা: ফুসফুস থেকে শুরু করে স্বরযন্ত্র, জিহ্বা, তালু, দাঁত, ঠোঁট, নাক প্রভৃতি ধ্বনি উচ্চারণে সহায়ক সকল প্রত্যঙ্গের সমষ্টিকে একত্রে বাগযন্ত্র বলা হয়; তাই তালিকার সবকটি অংশই বাগযন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত।

[৪৩তম বিসিএস]

৪. বাংলা লিপির মূল উৎস কী?

(ক) সংস্কৃত লিপি (খ) চীনা লিপি (গ) আরবি লিপি (ঘ) ব্রাহ্মী লিপি

উত্তর: (ঘ) ব্রাহ্মী লিপি

ব্যাখ্যা: বাংলা লিপির উদ্ভব ঘটেছে প্রাচীন ভারতীয় ব্রাহ্মী লিপি থেকে। ব্রাহ্মী লিপির পূর্বাঞ্চলীয় শাখা কুটিল লিপির ধারাবাহিকতায় বাংলা লিপি তার বর্তমান রূপ লাভ করেছে।

[১৪তম বিসিএস]

৫. বাংলা বর্ণমালার উৎস হিসেবে নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) তিব্বতি লিপি (খ) ব্রাহ্মী লিপি (গ) খরোষ্ঠী লিপি (ঘ) দেবনাগরি লিপি

উত্তর: (খ) ব্রাহ্মী লিপি

ব্যাখ্যা: বাংলা বর্ণমালার উদ্ভব ঘটেছে প্রাচীন ব্রাহ্মী লিপি থেকে (ব্রাহ্মী → কুটিল লিপি → বাংলা লিপি); ভারতীয় উপমহাদেশের অধিকাংশ লিপিরও উৎস ব্রাহ্মী লিপি।

[১৬তম শিক্ষক নিবন্ধন (স্কুল পর্যায়)]

৬. বাংলা বর্ণমালায় মাত্রাবিহীন বর্ণের সংখ্যা কয়টি?

(ক) ১০ (খ) ৮ (গ) ১১ (ঘ) ৯

উত্তর: (ক) ১০

ব্যাখ্যা: বাংলার মোট ৫০টি বর্ণকে মাত্রার উপস্থিতি অনুযায়ী তিন ভাগে ভাগ করা হয় — পূর্ণমাত্রা, অর্ধমাত্রা ও মাত্রাহীন বর্ণ। এর মধ্যে মাত্রাহীন বর্ণের সংখ্যা ১০টি।

[প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা ২০১৬ (মুক্তিযোদ্ধা কোটা)]

৭. বাংলা বর্ণমালায় পূর্ণমাত্রার বর্ণ কয়টি?

(ক) ২৮টি (খ) ৩২টি (গ) ২৬টি (ঘ) ৩০টি

উত্তর: (খ) ৩২টি

ব্যাখ্যা: বাংলা বর্ণমালার মোট ৫০টি বর্ণের (স্বরবর্ণ ১১টি ও ব্যঞ্জনবর্ণ ৩৯টি) মধ্যে মাত্রার ভিত্তিতে পূর্ণমাত্রার বর্ণ ৩২টি (স্বরবর্ণে ৬টি ও ব্যঞ্জনবর্ণে ২৬টি), অর্ধমাত্রার বর্ণ ৮টি এবং মাত্রাহীন বর্ণ ১০টি।

[পূবালী ব্যাংক প্রবেশনারি জুনিয়র অফিসার ২০২৩]

৮. নিচের কোনটি পরাশ্রয়ী বর্ণ?

(ক) ঃ (খ) ঞ (গ) ং (ঘ) ঐ

উত্তর: (ক) ঃ

ব্যাখ্যা: বিসর্গ (ঃ) নিজে স্বাধীনভাবে উচ্চারিত না হয়ে সম্পূর্ণভাবে পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির উপর নির্ভরশীল থাকে, তাই একে পরাশ্রয়ী বর্ণ বলা হয়।

[১৬তম বিজেএস (বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস) প্রিলিমিনারি]

৯. নিচের কোনটি মূল বা মৌলিক স্বরধ্বনি নয়?

(ক) উ (খ) অ (গ) এ (ঘ) ঔ

উত্তর: (ঘ) ঔ

ব্যাখ্যা: বাংলা প্রমিত উচ্চারণে মৌলিক স্বরধ্বনি সাতটি — অ, আ, ই, উ, এ, ও

ও অ্যা। 'ঐ' প্রকৃতপক্ষে দুটি স্বরধ্বনির (ও+উ) সংযুক্ত রূপ বলে এটি যৌগিক বা দ্বিস্বরধ্বনি, মৌলিক ধ্বনি নয়।

[প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা ২০১৬ (মুক্তিযোদ্ধা কোটা)]

১০. বাংলায় মৌলিক স্বরধ্বনি কয়টি?

(ক) ২টি (খ) ৭টি (গ) ৫টি (ঘ) ৩টি

উত্তর: (খ) ৭টি

ব্যাখ্যা: বাংলা ভাষায় মৌলিক স্বরধ্বনি সাতটি — অ, আ, ই, উ, এ, ও এবং অ্যা। ঐ ও উ-এর দীর্ঘরূপ ঐ উচ্চারণে যথাক্রমে ই ও উ-এর অনুরূপ, আর ঐ ও ঐ যৌগিক ধ্বনি বলে এই সাতটির বাইরে আলাদাভাবে গণ্য হয়।

[১৮শ বিজেএস (বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস) প্রিলিমিনারি]

১১. ওষ্ঠাধ্বনি হিসেবে নিচের কোন সেটটি সঠিক?

(ক) প, ফ, ব, ভ, ম (খ) চ, ছ, জ, ঝ, ঞ (গ) ট, ঠ, ড, ঢ, ণ (ঘ) ত, থ, দ, ধ, ন

উত্তর: (ক) প, ফ, ব, ভ, ম

ব্যাখ্যা: উচ্চারণের সময় দুই ঠোঁট (ওষ্ঠ) পরস্পর স্পর্শ করে যেসব ব্যঞ্জনধ্বনি উৎপন্ন হয়, সেগুলোকে ওষ্ঠাধ্বনি বলে — প, ফ, ব, ভ, ম। চ-বর্গ তালব্য, ট-বর্গ মূর্ধন্য এবং ত-বর্গ দন্ত্য ধ্বনি হিসেবে পরিচিত।

[পূর্বালী ব্যাংক প্রবেশনারি জুনিয়র অফিসার ২০২৩]

১২. নিচের কোনটি দন্ত্যধ্বনি?

(ক) ণ (খ) প (গ) ত (ঘ) চ

উত্তর: (গ) ত

ব্যাখ্যা: 'ত' একটি দন্ত্যধ্বনি — উচ্চারণের সময় জিহ্বাগ্র উপরের পাটির দাঁতের গোড়ায় স্পর্শ করে। দন্ত্য বর্গের ধ্বনি হলো ত, থ, দ, ধ, ন। এখানে ণ

মূর্ধন্য, প ওষ্ঠ্য এবং চ তালব্যধ্বনি।

[১১তম শিক্ষক নিবন্ধন (কলেজ পর্যায়)]

১৩. 'স্বরসঙ্গতি'-র সবচেয়ে উপযুক্ত উদাহরণ কোনটি?

(ক) দেশি, বেশি (খ) দেশি > দিশি (গ) ক, খ (ঘ) কোনোটিই নয়

উত্তর: (খ) দেশি > দিশি

ব্যাখ্যা: স্বরসঙ্গতি হলো একটি স্বরধ্বনির প্রভাবে শব্দের অন্য স্বরধ্বনিরও রূপ বদলে যাওয়া। 'দেশি' শব্দের পরের ই-ধ্বনির প্রভাবে আগের এ-ধ্বনিটি ই-তে পরিণত হয়ে 'দিশি' রূপ নেওয়া এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

[বাংলাদেশ ব্যাংক সহকারী পরিচালক (এডি) ২০১০]

১৪. ধ্বনি পরিবর্তন সাধারণত কত প্রকারের হয়ে থাকে?

(ক) পাঁচ প্রকার (খ) দুই প্রকার (গ) তিন প্রকার (ঘ) চার প্রকার

উত্তর: (ঘ) চার প্রকার

ব্যাখ্যা: প্রচলিত শ্রেণিবিভাগ অনুযায়ী ধ্বনি পরিবর্তনের চারটি প্রধান ধারা ধরা হয় — স্বরাগম, স্বরলোপ, ধ্বনি বিপর্যয় ও সমীভবন; তবে বিভিন্ন ব্যাকরণ গ্রন্থে উপবিভাগের সংখ্যায় কিছুটা ভিন্নতা দেখা যায়।

[প্রাইমারি সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা ২০১৯ (১ম ধাপ)]

১৫. 'বন্ধন' শব্দের সঠিক অক্ষর বিন্যাস কোনটি?

(ক) ব + ন্ + ধ + ন্ (খ) বন্ + ধন্ (গ) ব + ঙ্গ + ন (ঘ) বান্ + ধন্

উত্তর: (খ) বন্ + ধন্

ব্যাখ্যা: অক্ষর হলো বাগযন্ত্রের স্বল্পতম প্রয়াসে উচ্চারিত ধ্বনিগুচ্ছ। 'বন্ধন' শব্দটি উচ্চারণের সময় দুইবারে বিভক্ত হয় — বন্ ও ধন্, দুটিই ব্যঞ্জনধ্বনি দিয়ে শেষ হওয়া বন্ধাক্ষর।

[৩৬তম বিসিএস]